KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল- ১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর ও রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫১/৯ ৫১/১০ ৫১/১১ ৫১/১২	Year of Publication পৌষ ১৩৯৭ ॥ Jan 1991 মাঘ ১৩৯৭ ॥ Feb 1991 ফাল্গুন ১৩৯৭ ॥ March 1991 চৈত্র ১৩৯৭ ॥ April 1991
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ১১ মার্চ ১৯৯১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

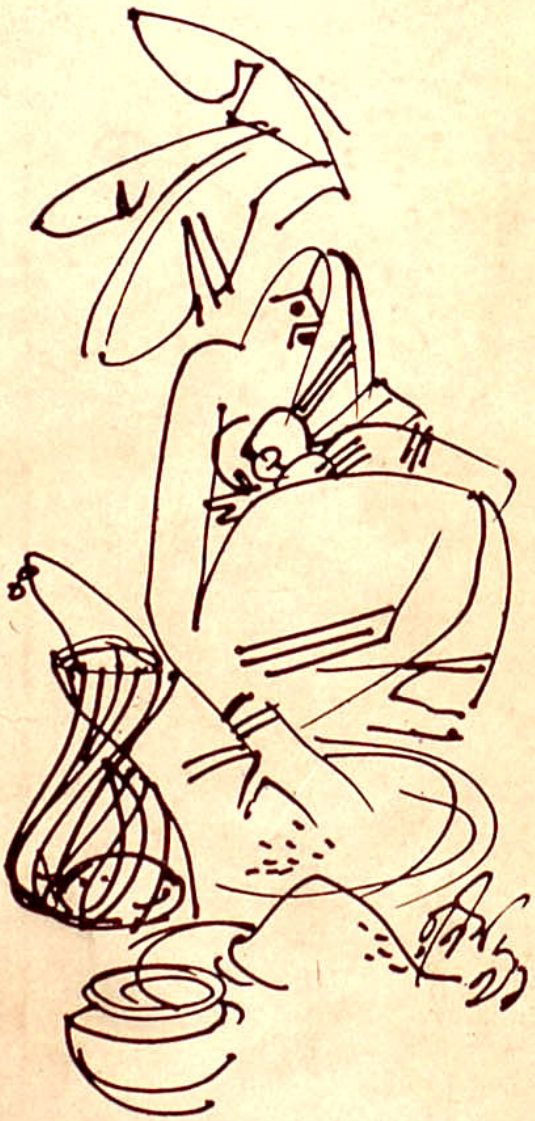

শিল্পী যামিনী রায় প্রসঙ্গে কবি বিষ্ণু দে-জায়া প্রণতি দে-র দীর্ঘ স্মৃতিচারণ, যাতে আছে বহু অজানা তথ্য।

জন্মশতবর্ষে এস ওয়াজেদ আলির সমাজচিন্তার অধ্যাপক অলোক রায়-কৃত মূল্যায়ন।

উপসাগরীয় সংকটের পটভূমি বর্ণনা করেছেন সুপরিচিত ইতিহাসবিদ এ·ডবলিউ·মামুদ।

"ভারতে ইসলামে আমরা গোঁড়া ধর্মান্ধতার একটা ধারাও প্রত্যক্ষ করি"—তথ্যপ্রমাণসহ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত।

গণমুক্তির দিশা-সন্ধানী আহমদ শরীফের একখানি গ্রন্থের বিচার।

প্রবীণ বিপ্লবী বঙ্গেশ্বর রায়ের দুখানি অনবদ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা।

সাঁওতালি সমাজে নবোদ্ভূত এলিট সম্প্রদায়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে কে এল হাঁসদার প্রতিবেদন।

রোগের চিকিৎসায় শরীর মন ও তার আন্তঃসম্পর্কের গুরুত্ব প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক ধ্যানধারণা নিয়ে ড· জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন।

* * *

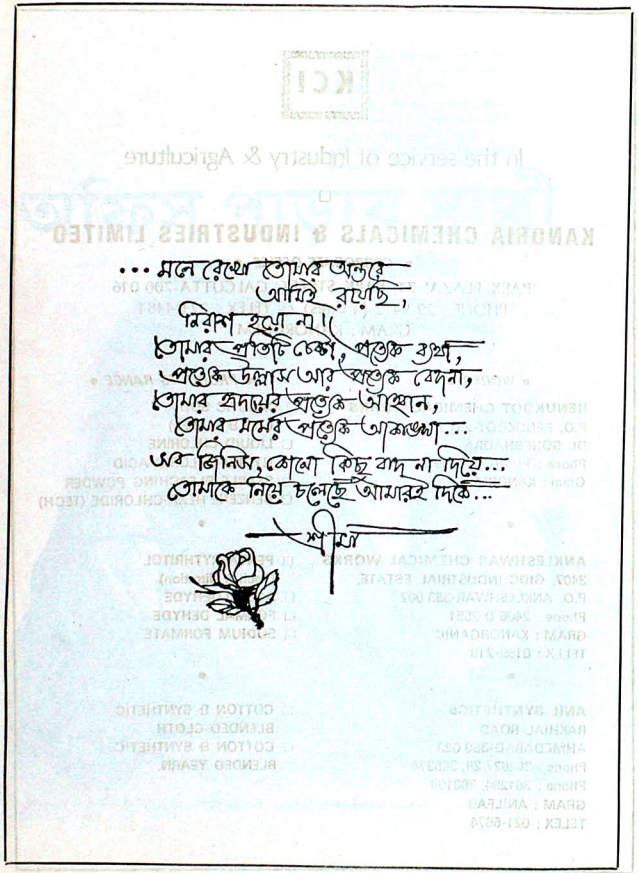

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

—শ্রীমা

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ১১
মার্চ ১৯৯১
ফাল্গুন ১৩৯৭

যামিনী রায় ও আমরা প্রণতি দে ৮৪৫
জন্মশতবর্ষে এস. ওয়াজেদ আলি অলোক রায় ৮৬৫
উপসাগরীয় সংকটের পটভূমি এ. ডব্লিউ. মাহ্‌মুদ ৮৮২

সেই দেখা আর এই অরুণ মিত্র ৮৬০
শীতপ্রহর ধ্রুব দে ৮৬২
রক্ত-পদচ্ছাপ রেজাউদ্দিন স্টালিন ৮৬৩
কলকাতায় বৃষ্টি বাসুদেব দেব ৮৬৪

ঘুঘু ডাকে সাধন চট্টোপাধ্যায় ৮৭২

প্রতিবেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি ৮৮৮
সাঁওতালি সমাজ... কে. এল. হাঁসদা

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৮৯৩
রোগচিকিৎসায় শরীর-মন-পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থসমালোচনা ৯০০
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘ মুখোপাধ্যায়, অরুণা হালদার,
অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

মতামত ৯১৭
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণু গুহঠাকুরতা, প্রণবেশ নাথ

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

Hindustan Wires Limited

Registered Office :

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016

Phone : 44-6745 (3 lines) Telegram : WIREFIELD

Factory :

B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas

Phone : 58-1947, 58-1934

Manufacturers of :

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle Spoke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &

MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED

JAPAN

যামিনী রায় ও আমরা

প্রণতি দে

'নিবিড় সুখে মধুর দুখে জড়িত ছিল সেই দিন'

যামিনী রায়ের নাম আগেই শুনেছিলুম, মনে হয়, আমার মায়ের কাছে। বোধহয় জোড়াসাঁকোর কোনো একজিবিশনে গিয়েছিলুম, হয়তো অবনীন্দ্রনাথের, তখন মা আমাদের দেশজ আরেকজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম উল্লেখ করে আমায় বলেছিলেন। আমার মায়ের শখে আমি একটু ছবি আঁকতুম। আমার বাবা প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, ভালো ছবি আঁকতেন, ছবি তোলার (ফোটোগ্রাফির) শখ ছিল, অনেক কমপিটিশনে প্রাইজও পেয়েছিলেন—তার কিছু লক্ষণ হয়তো আমার মধ্যে দেখে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই, আমার বিয়ের পর, ১৯৩৪ সালে, যখন আমার স্বামীর কাছে যামিনী রায়ের নাম শুনলুম, মনে হল যেন আমার একটা স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে। সুধীনবাবুর বাড়ি—উত্তর কলকাতায়—"পরিচয়"-এর আড্ডায় আমার স্বামী তো প্রতি শুক্রবার যেতেন। সেখানে যামিনী রায়ও মাঝেমাঝে যেতেন। যামিনী রায় তখন বাগবাজারে থাকতেন, চঞ্চলবাবু আর আমার স্বামী বাগবাজারে প্রায়ই যেতেন। চঞ্চলবাবুই আমার স্বামীকে প্রথম একটা নীল রঙের ছবি কিনে দেন, যামিনী রায়ের সহজ কিন্তু দৃঢ় লাইনের কাজ, কিন্তু খুব জোরালো। সেটি আমাদের আছে। চঞ্চলবাবু নিজে একটি মা ও ছেলের ছবি কিনেছিলেন, যেটা কিছুদিন আমাদের ঘরের দেয়াল আলো করে ছিল, কিছুদিন পরে উনি নিজের ঘরে নিয়ে যান। কিন্তু, আমি নিজে, ১৯৩৫ সালের ডিসেমবরের আগে যামিনীদার বাড়ি যেতে পারি নি। সেই সময়ে যামিনীদা একটি একজিবিশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের সরু গলি পেরিয়ে যখন যামিনীদার ঘরে ঢুকলাম —হঠাৎ আমার সামনে খুলে গেল কী এক অপূর্ব আনন্দের জগৎ—সেখানে ঢুকে আমি সত্যিই বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। চারিদিকে ছবি —কিছু সাজানো, দেয়ালের গায়ে ছোটো চৌকির উপরে, কিছু এমনি রাখা ছিল দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড় করানো—আমি বিভোর দৃষ্টিতে এক কোনায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম—একটা ছবির দিকে তাকিয়ে। যামিনীদার শত কাজের মধ্যেও আমার সে দৃষ্টি ওঁর চোখ এড়ায় নি। 'কেমন লাগছে, বউমা?' আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, একটু দূর থেকেই। যামিনীদার প্রশ্নের সত্য উত্তরই করলুম : 'চোখ ফেরাতে পারছি না যে!' তক্ষুনি যামিনীদা হাতের কাজ রেখে আমার কাছে এলেন, কোন্ ছবিটা দেখছ? 'যশোদা মাতা'—হেসে

বললেন। আমার স্বামীও আমার দৃষ্টি দেখেই বোধ-হয় বললেন : 'যামিনীদা, এই ছবির দাম কত হবে? এটা আমরা নেব।' দাম ছবিটার সাইজের পক্ষে খুবই সামান্য, কিন্তু তখন আমাদের পক্ষে সেটাই প্রচুর। তাই আমি দ্বিধান্বিতভাবে ওঁকে বারবার বারণ করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু উনি শুনলেন না—ওটা আমায় কিনে দিলেন। ছবিটি কাপড়ের উপরে আঁকা —যামিনীদাই দেখালেন—বলে দিলেন, তখনই, মিহি করে ছেঁকে গোবর-গঙ্গামাটি মিশিয়ে কাপড়ে প্রলেপের মতো লেপে, শুকিয়ে, তার উপর চুনের রঙ আস্তরণ দিয়ে ওঁর নিজস্ব ক্যানভাস তৈরি। মাত্র পাঁচটি রঙে আঁকা ছবিটি যে কী প্রাণবন্ত : সাদা কালো (যামিনীদা ভুসো ব্যবহার করতেন), এলা রঙ, গেরিমাটি লাল, অল্প একটু সবুজ—কদমফুলের পাতাগুলির জন্য। কিন্তু পরে, অনেক পরে, আমি আবিষ্কার করি যে পা-দুটি ভুল আঁকা হয়েছে,—দুটোই ডান পা। পরে, আমি যামিনীদাকে দেখাই। যামিনীদা, এই ছবির ডিজাইনে, আরো ঢের ছবি এঁকেছেন,—যেমন আমার ভাই একটা কিনেছে, কাঠের উপরে আঁকা, তাতে পা দুটো শুধরে দিয়েছেন; কিন্তু আমাদের ছবিটার চোখের চাহনি (এক্সপ্রেশন) এমন সুন্দর আনন্দে ভাসা-ভাসা—আমার ধারণা এরকম আর কোনো ছবিতে হয় নি! আমার এক কাকা রামকৃষ্ণ মিশনের "সাধু"। তিনি একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। ছবিটা দেখে বললেন —'এ ছবি তুই কোথায় পেলি? এ যে আনন্দের প্রতিমূর্তি! জীবনের আনন্দ!' কিন্তু মজার কথা, এই ছবিতে, বা এই সময়ের অনেক ছবিতেই, যামিনীদার সই থাকত না। তখন উনি সই করতেন না—ওঁর সই ছিল ছোটো গোল সাদা স্টাইলাইজড্ কদমফুল। অথবা, ওঁর নিজের রচিত ছোট্ট একটি নকশার ডিজাইন। যুদ্ধের সময়ে ও পরে, বিশেষ করে বিদেশীদের অনুরোধে, যামিনীদা ছবিতে সই করা শুরু করলেন। ওঁর ছবি—মানে ওঁরই ডিজাইন —অন্যের অনুরোধে কপি করতে তখনই আরম্ভ করেন, বাধ্য হয়ে। যেমন আমার ভাই করিয়ে-ছিল—সেটা বোধহয় কাঠের উপর আঁকা কিন্তু শাড়ির রঙ ভিন্ন, পা-দুটি ডান ও বাঁ পা ঠিকই আছে। আমার একটি বন্ধু আমাদের ছবিটির ঠিক প্রতিকৃতি চেয়েছিল, কিন্তু ছোটো—ও বড়ো ছবি চায় নি—অন্য ছবি সে নেবে না! যামিনীদা তাই করে দিয়েছিলেন, বেলেতোড় থেকে। অনেকে এই নিয়ে যামিনীদাকে দোষী করেছেন, কিন্তু আমি এতে কোনো অন্যায় দেখি না। আমরা তো জেনে-শুনেই, দেচ্ছায় নিচ্ছি, ছবিটা ভালো লাগে বলেই, যামিনীদা নিজে দেখে করে দিচ্ছেন, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত—ওঁরই ছবি ও ডিজাইন। আমরা বাজারে যে বিদেশী ছবির প্রিন্ট কিনি, সেই দরেই তো যামিনীদার নিজের রঙে আঁকা ছবি পাচ্ছি। যেমন, একটা ছবির কথা মনে পড়ে—গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ। আমাদের বাড়িতে তার একটা ছোটো কপি আছে। যামিনীদা নিজেই ওই ছবি বড়ো করে এঁকে শান্তিনিকেতনে "রবীন্দ্রসদনে" উপহার দিয়ে-ছিলেন। মনীষা গ্রন্থালয়ের দিলীপ বসু তাঁর দোকানের জন্য, অর্ডার দিয়ে, ঠিক ওই ছবিটিই যামিনীদাকে দিয়ে আঁকান। অন্য জায়গায়ও ওই ছবিটি দেখেছি—দেখলেই, সব সময়েই আমার একলার কেন, আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবের খুব আনন্দ হয়—যেন চেনা বন্ধুকে আবার দেখলুম। ছবির কাজ আনন্দ দেওয়া—আমার মনে হয় কপি থাকলে সেটা যদি আনন্দ দিতে পারে, তো ক্ষতি কী?

পরে, আমার স্বামীর সঙ্গে আমি আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাগবাজারের বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। একবার গিয়ে দেখলুম সুধীনবাবুর অপূর্ব একটা পোর্ট্রেট—কিন্তু যামিনীদা সুধীনবাবুকে লাল রঙের শার্ট পরিয়েছিলেন, সবুজ রঙের "টাই" দিয়ে। কিন্তু কী অপূর্ব বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি—যেমন ধারালো

চোখ ছিল সুধীনবাবুর, আর কী জোরালো ডান কানটা, যেটা যামিনীদার ছবিতে ধরা পড়েছিল, যামিনীদার অপূর্ব সুন্দর নজরে। শুনলুম, সুধীন-বাবুর কোনো বন্ধুর বিদেশী স্ত্রী সুধীনবাবুর একটি পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন –ঠিক হয় নি বলে যামিনীদার কাছে আনেন সংশোধনের জন্য। যামিনীদা তো সংশোধনে বিশ্বাস করতেন না, তাই তিনি সবটা সাদা রঙে চাপা দিয়ে ছবিটি ফিরে এঁকেছিলেন—সে যে কী অপূর্ব পোর্ট্রেট—সুধীনবাবুর ছোট্ট মজার হাসিটি পর্যন্ত চোখের আর ঠোঁটের কোণে অপূর্ব ফুটে উঠেছিল। আমরা দুজনেই খুব আনন্দিত হয়েছিলুম যে যামিনীদা, অনুরোধে, তবু একটা পোর্ট্রেট আঁকলেন। কিছুতেই আঁকতে চাইতেন না, —যদিও তখন ওঁর দারুণ পশার ছিল এই পোর্ট্রেট ও তেল রঙে আঁকা বিদেশী স্টাইলের ছবির। কিন্তু পরে খুব দুঃখের সঙ্গেই জানলুম যে পোর্ট্রেটও যামিনীদা রাখেন নি, তার উপর অন্য একটা ছবি এঁকেছিলেন। প্রয়োজন হলে যামিনীদা এইরকম নিষ্ঠুরভাবে পুরোনো ছবির উপর সাদা রঙ লেপটে, ওঁর নতুন ডিজাইনের ছবি আঁকতেন। তখন যা মাথায় আসত। যখন ওঁর মনে হল যে ওই পদ্ধতিতে ছবি আঁকা আমাদের দেশজ নিয়ম নয়, বিদেশী নকল, তখন থেকে নিজের দেশের এবং নিজস্ব স্টাইল খুঁজতে শুরু করলেন।

সে বহু বছরের প্রচণ্ড ক্লেশ—এখন সকলেই জানেন, কিন্তু তখন খুব ঝড় বয়ে গেছে ওঁর নিজের এবং পরিবারের উপর দিয়ে—কিন্তু কিছুতেই হার মানেন নি। প্রথম যেদিন আমি যামিনীদার বাড়ি যাই, সেই দিনই আমি ওঁদের বাড়ির দোতলায় যাই, ওঁর স্ত্রী আর কন্যা সুনীতির সঙ্গে আলাপ হয়। আমি যামিনীদার স্ত্রীকে 'দিদি' বলতুম, আর ওঁদের বাড়িতে আমি বোনেরই স্থান পেয়েছিলুম। দিদির কাছে আমি যামিনীদার ইচ্ছাকৃত সংগ্রামের কথা কত যে শুনেছি। দিদি আমায় বলেছিলেন, চোখের জলে, যে এমন দিন গিয়েছে যে বাচ্চাদের এক পয়সার মুড়ি ছাড়া কিছু দিতে পারেন নি। আমি আমার স্বামীকে এই কথা বলি। অথবা, যামিনীদার খুব জ্বর হয়েছে, কিন্তু ডাক্তার ডাকার সামর্থ্য নেই। যামিনীদার আবার খুব মজার স্বভাব ছিল—সহজ সরল মানুষটি—যা আমি নিজেও পরে দেখেছি, এখন মনে পড়ছে—শারীরিক কষ্ট, যেমন জ্বরের কষ্ট বা শরীরে ব্যথা সহ্য করতে পারতেন না—জোরে-জোরে 'ওঃ বাব্বা—আর পারি না!' বলে চেঁচামেচি বা হাঁকডাক করতেন! একবার বেলেতোড়ে ওঁর জ্বর হয়েছিল, আমি তখন ওখানে ছিলুম—খুব জোরে-জোরে এরকম বলছেন, আর দেখি দিদির, সুনীতির, বউমার, ছেলেদের সকলের মুখ শুকিয়ে চুন! জ্বর একটু কমে গেলেই সব চুপচাপ! আমি পরে যামিনীদাকে বলেছিলুম—'খুব কষ্ট হচ্ছিল? একটু কমে আরাম হয়েছে তবু!' যামিনীদা হেসে আমায় বললেন—'কষ্ট হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু ওই চেঁচামেচি করলে আমার মনে হয় যেন কষ্টটা কম হয়!' আমি ওঁকে বোঝাবার জন্য বলেছিলুম—কিন্তু আপনার ওইরকম কষ্টের আওয়াজে দিদিদের বড্ড ভয় আর ভাবনা হয়। আপনি কি বুঝতে পারেন? যামিনীদা হেসে আমায় বলেছিলেন, 'জানি, বউমা! কিন্তু ভুলে যাই। যখন কষ্ট হয়, মনে হয় চেঁচামেচি করলে সকলে বুঝবে আমার কত কষ্ট হচ্ছে। তাতে হয়তো আমার কষ্টটা একটু কমবে। কমে না জানি, তবু চেঁচাই!!' এমন মজার সরল লোক—নিজের দুর্বলতা নিজেই জানেন, এবং মানতে লজ্জা বা দ্বিধা নেই। আর দিদিরও তেমনিই সহ্যশক্তি! সমানভাবে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কষ্ট করে গেছেন কত যে বছর, তার হিসেব নেই! কিন্তু যদি অল্প-স্বল্পও তেল-রঙা ছবি আঁকতেন তাহলে সে ছবি বেশি দামে বিক্রি হয়ে যেত—সংসারে অসুবিধা কম হত! কিন্তু সে তো যামিনীদার চরিত্র-বিপরীত—যখন মনে করছেন কাজটি ঠিক নয়—কখনও তা

করবেন না। কিন্তু যামিনীদাকে তাই বলে যদি কেউ ভাবেন—রিভাইভালিস্ট, খুব অন্যায় বলা হবে। বা পটুয়া শিল্পী—কারণ তিনি কোনোটাই ছিলেন না। পটুয়াশিল্পীদের আঁকার ও বলার পদ্ধতি তো ছিল ভিন্ন। এবং যামিনীদা নিজস্ব স্টাইল খুঁজ-ছিলেন, দেশজ ধরনে। যেমন ওঁর অল্প সীমিত লাইনেই দিদির বা সুনীতির পোর্ট্রেট সহজেই চেনা যায়—যদিও সেগুলি পোর্ট্রেট হিসেবে আঁকেন নি—এই ধরনে ছবি দেখলে দর্শকেরও আনন্দ হত। যামিনীদার বাড়ি গেলেই মনটা আনন্দে ভরে যেত—মনে হত যেন একটা মহৎ কাজ হচ্ছে, এবং গোটা পরিবার সে বিষয়ে অবগত আছেন, এবং সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করছেন যেন সেই কাজটি সুন্দর আর সার্থকভাবে হয়, তাঁদের নিজেদের ক্ষমতা দিয়ে যামিনীদাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন। দিদির সঙ্গে তো আমার বেশ অন্তরঙ্গতা হয়ে গেলই, সুনীতির সঙ্গে তো বটেই, পরে বেলেতোড়ে বড়ো বউমা বিভার সঙ্গেও। আর পটলের সঙ্গে, যদিও সে অনেক ছোটো—তবু তার সঙ্গে বয়সবিহীন যে আত্মিক সম্পর্ক হল শেষ পর্যন্ত তার গভীরতা যেন মাপা যায় না। পরে, পটলের স্ত্রী রেবার সঙ্গেও, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তো বটেই। বেলেতোড়ে রোজ পটল নানা রকমের ভয়ের আজগুবি খবর শুনত, আমাকে সেগুলি অতিরঞ্জিত করে বলত খানিকটা নিজেও ভয় পেয়ে, খানিকটা আমাকে খ্যাপাতে আর ভয় পাওয়াতেও হয়তো—মজা দেখবার জন্যও বোধহয় —আমিও ভান করে ওর সঙ্গে সায় দিতুম অসহায় ভাবে—যেমন, 'তাহলে, ভাই, আমাদের কী হবে, বলো তো?'—সে যখন একদিন আমাকে খবর জানাল—জাপানিরা বোমা ফেলে হাওড়া স্টেশন উড়িয়ে দিয়েছে—আমি প্রতিবাদ করেছিলুম যে কাল তো ওঁর চিঠি আর খবরের কাগজ পেয়েছি! ও জানাল—তারপর এই ঘটনা হয়েছে!—আমি, একটু ভান করেই হয়তো, ভীত ভাবে যেন, ওকে বললুম—তাহলে, আমাদের কী হবে? উনিও আসবেন না, আর আমরা বাঁচব কী করে? আমার কাছে তো সামান্যই কিছু টাকা আছে! পটলও তখন একটু অপ্রস্তুত হয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিল বোধহয়। এ রকম অনেক টুকরো মজার ও ভয়ের ঘটনা মনে পড়ছে।

আমাদের বেলেতোড়ে যাওয়ার ঘটনাটাতে আসি।

১৯৩৮ ১লা ডিসেম্বরে আমার শ্বশুরমহাশয়ের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার দরুন আমাদের পরিবারের ব্যবস্থাপনার কিছু রদবদল হয়। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সুন্দর বড়ো বাড়ি[১] ছেড়ে ছোটো একটা বাড়ি —১৯এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে উঠে যাই, আর আমি পাড়ারই ছোটো একটা স্কুলে কাজ নিলুম আমার স্বামীকে একটু সাহায্য করতে পারব ভেবে। তখনও আমরা আমাদের বড়ো মেয়ে ইরাকে নিয়ে যামিনীদার বাগবাজারের বাড়িতে যেতুম, ইরা অনেক সময় সুনীতির (ওর 'দিদি', খুব ভালোবাসত) কাছে যাবার জন্য বায়না ধরত। হঠাৎ একদিন আমার স্বামী আমায় জানালেন যে যামিনীদাই আমাদের বাড়িতে আসবেন। সেই প্রথম তাঁর আসা, আমাদের বাড়িতে। আমাকে ওঁর নিজের রঙ তৈরি করা এবং ছবিতে সেগুলি ব্যবহার করার পদ্ধতি দেখানো। আমাকে একটা ছবি এঁকে রাখতে হবে। আমি, তখন, মাঝে-মাঝে, আমার স্বামীর তাগাদায়, সময় হলে, ছবি আঁকতুম, আমার মায়ের দেওয়া উইনডসর অ্যানড নিউটন রঙ দিয়ে। যামিনীদার রঙ আলাদা জানতুম, কালো তৈরি হয় ভূ.সা-আঠা দিয়ে সমান ভাবে গুলে, এলা আর গেরিমাটি লাল আর হলুদ, সিঁদুরও সমানভাবে আঠায় গুলে লাল, ইত্যাদি। অনেক পাথর গুঁড়ো করেও রঙ তৈরি হত দেখেছিলুম। কিন্তু যামিনীদার জন্য ছবি এঁকে রাখতে হবে—ভয়ে-দ্বিধায় তো আমি কাঁটা! তবু বুঝেছিলুম—রেহাই নেই! আমাদের ছোটো মেয়ে তারা তখন ছোটো, আর ওকে নিয়েই আমার মন তখন ভরপুর। তাই

মা মেয়েকে ঝিনুক-বাটি দিয়ে কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে—এই ছবিই আঁকলুম। ছবিটা শেষ করে দেখলুম বউটির মাথায় ঘোমটা দিয়েছি—কিন্তু ছবির বাকি পাশটা যেন কী রকম খালি বেমানান লাগছিল। সেটার ব্যালেন্সের জন্য একটা কুলুঙ্গি এঁকে তার মধ্যে একটা প্রদীপ বসিয়ে দিয়েছিলুম। যামিনীদা ছবিটি দেখে খুশি হয়ে নিয়ে গেলেন। আমি তখন জানতুম না যে যামিনীদা ছোটোদের আঁকা ছবি এবং আমার মতো আনকোরা নতুন আঁকিয়েদের ছবিও রাখতেন! ছোটোদের ছবি আর তাদের রঙ-ব্যবহার ওঁকে অনুপ্রেরণা দিত। যামিনীদা নিজেও সেদিন আমাদের বাড়িতে দুটি ছবি এঁকেছিলেন—একটি আমার মায়ের দেওয়া উইনডসর অ্যানড নিউটন রঙে আঁকা ল্যানড-স্কেপ—সেটা কী করে জানি নষ্ট হয়ে গেল, অন্য ছবিটা আমাদের ঘরের একটি ফুলদানিতে ফুল ছিল, সেটার প্রতিকৃতি, ওঁর নিজের রঙ দিয়ে আঁকা—সেটা এখনো আমাদের আছে। আমার স্বামীর আমায় উপহার দেওয়া একটি ড্রইং-বোর্ডের উপর পাতলা কাগজ একটু জল দিয়ে সেঁটে নিয়ে কোণগুলি কাগজের স্ট্রিপে আঠা দিয়ে আটকে নিয়ে ছবিটি এঁকে ছিলেন—আমিও পরে এইভাবে ছবি এঁকেছি।

আমার শাশুড়ি তখন ছিলেন, তিনিও যামিনীদার কাছে এসে বসতেন। আমার সঠিক স্মরণে নেই, বোধহয় এই সময়েই সুনীতির আর ধর্মদাসের বিয়ে হয়—বউ বিভাকে আমার খুব ভালো লাগত। সেও আমাদের খুব শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত, যত্ন করত। সেই সময়েই, বোধহয় যামিনীদা পটলকে ওর স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ওঁর সঙ্গে কাজে লাগালেন। পটল তখন স্কুলের উচ্চতর কোন শ্রেণীতে পড়ত—অনেকেই বারণ করেছিলেন যামিনীদাকে। আমার স্বামীও বোধহয় আপত্তি করেছিলেন, পটলের ক্ষতি আশঙ্কা করে। পটলের ছবি যা সুন্দর হত, ছোটো বয়স থেকেই—ওর লাইনের জোর দেখে আমরা মুগ্ধ হতুম। আর, কী কাজই না করত তখন—রঙ গোলা থেকে আরম্ভ করে, ছবি আঁকার কাগজ বোর্ড ক্যানভ্যাস তৈরি করা—পরে বাঁধাই —সব কাজই করত পটল—আমরা ওর কার্যক্ষমতা দেখে অবাক হয়েছি! পরে তো যামিনীদার ছবি নিয়ে দিল্লী-বোম্বাই কোথায় না গেছে! ওরকম কর্মঠ ছেলে আমাদের দেশে বিরল। তারপর তো ওর নানারকম কাজ—কাপড়ের ছাপ—ওর নিজস্ব ডিজাইন। তারপর মোজেইক-মুরাল্‌স্! আমার তো ধারণা ও খেটে-খেটে নিজের শরীর পাত করল! এরকম ছবি আঁকার নানা প্রতিভায় বলবান কমই দেখেছি বা শুনেছি! তার উপরে পোর্ট্রেট আঁকার হাত দারুণ—আমাদের ঘরে তার চিহ্ন আছে ওর একটা ছবি—নিজের স্মরণ থেকে আঁকা। কোনো স্কেচ বা কিছু আগে করে নি।

আমি যে ছোটো স্কুলটিতে কাজ নিয়েছিলুম সেটার দায়িত্ব আমাকে সেই ১৯৩৯-এর অগস্ট মাস থেকেই নিতে হয়েছিল প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হিসাবে। যিনি ছিলেন প্রধানা—শ্রীযুক্তা বীণাপাণি ঘোষ (শ্রদ্ধেয় ৺শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী) লেডি ব্রেবর্ন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হয়ে চলে গেলেন—তিনি আমার নাম বোধহয় বলে গিয়েছিলেন। কারণ তিনজনের মধ্যে আমাকেই নির্বাচন করা হল, বোধহয় বীণাদির সুপারিশের জন্যই, এবং হয়তো তখন আমি "স্টাফে" ছিলুম বলেও। ১৯৪০-এ আমাকে একটা ট্রেনিং নিতে হয় সরকারি শর্তানুযায়ী। আমার স্বামী তখন রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজে) পড়াতেন। অনেক পরিশ্রম করতে হত, রাত্রে ল-কলেজে ইংরিজি পড়ানোর ক্লাস, এবং অনেক টিউশানিও করতেন, শরীর ভালো ছিল না তা সত্ত্বেও। ১৯এ-র এ বাড়িটা ছোটো ছিল, মায়ের পক্ষেও অসুবিধা ছিল জানতুম, তবুও উপায় ছিল না বলে ১৯৩৯ এইভাবেই কাটাতে হয়েছিল। ১৯৩৯-এ স্কুলে যেতে-যেতে ১/১০-এর বাড়িটা তৈরি হচ্ছে দেখে, আমি

আমার স্বামীকে বললুম। যাঁর বাড়ি তাঁর সঙ্গে ওঁর বন্ধু চঞ্চলবাবুর আলাপ ছিল—চঞ্চলবাবু এই বাড়িটা ঠিক করে দিলেন—মায়ের (আমার শাশুড়ির) পক্ষে সুবিধা হল। এ বাড়িতেও যামিনীদা অনেকবার এসেছেন—খোলামেলা দেখে পছন্দ জানিয়ে গেছেন। আমরা আসবার আগেই আমি প্রফেসার অরুণ সেনকে (সমরবাবুর বাবা) জানিয়েছিলুম—উনি যখন আমাদের বলেছিলেন উনিও এ পাড়ায় বাড়ি খুঁজছেন—যে ১/৯-এর বাড়িটা খালি আছে। এবং আমরা ১/১০-এ আসার আগেই অরুণবাবু, তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন। ফলে, সমরবাবুরা কয়েক বছর আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন।

আমরা ১/১০-এ ১৯৩৯ এর ডিসেম্বরে আসি। অনেক মজার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেগুলি বাদ রেখে সমরবাবুর সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা হয়ে যায় আমার স্বামীর সঙ্গে, সেটাই সবথেকে পরম। মাঝে-মাঝে সমরবাবু এসে বলতেন (তখনও ছাত্র ছিলেন—বি. এ.-র না এম. এ. ক্লাসের ভুলে গেছি)—এই বইটা পাঠ্য আছে, সেটার উপর কী মিনিমাম পড়তে হবে, বলুন তো! সমরবাবুর সঙ্গে অনেক আগে থেকেই হৃদ্যতা হয়েছিল, চঞ্চলবাবুও কাছেই থাকতেন—আমাদের দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বাড়িটাও বেশি দূরে ছিল না—কাজেই খুব আড্ডা হত, অনেক বছর ধরেই—এখন পাশের বাড়ি হয়ে আরো বেশি হল। অল্প পড়েও কোনো দিন সমরবাবুকে দ্বিতীয় স্থানে নামতে হয় নি। উনি ওঁকে 'ফুক্-ফুক্ সেন' বলে ডাকতেন—সিগারেট খাওয়াতেও নাকি ওই 'ফুক্-ফুক্' ভাব, মানে ফাঁকি! কিন্তু কী আশ্চর্য মাথা, আর লেখার ক্ষমতা! সে কথাই বলতেন। অমলবাবু, গাবুবাবু—অন্য ভাইদের সঙ্গেও দারুণ বন্ধুত্ব হল। সমরবাবু কিন্তু ওঁকে বলতেন—'আপনার এই যামিনীরায়প্রীতি! আমি কক্ষনো ওঁর ছবি কিনব না!' বলেছিলেন, ওঁর ঠাকুরদাদার সঙ্গে যামিনীদার হৃদ্যতা ছিল, তবুও না!! একদিন আমার স্বামী সমরবাবুকে বললেন: 'আমাকে ২৫টা টাকা ধার দেবে?' 'কেন?' 'একটু দরকার আছে।' সমরবাবু ধার দিয়েছেন, আর উনি যামিনীদার একটি ছবি কিনে সমরবাবুর ঘরে টাঙিয়ে দিয়ে এলেন। এ নিয়ে বচসা কিছু হল নিশ্চয়ই। আমার মনে নেই কী ছবি এনেছিলেন—বোধহয় একটি সাঁওতাল ঢোলক নিয়ে—রোজ সমরবাবু ছবিটা নামিয়ে রাখতেন, বা উলটো করে রাখতেন, আর রোজ উনি সেটা সোজা করে দিয়ে আসতেন! চঞ্চলবাবুও এ মজাটার কথা জানতেন, এই খেলাটা উপভোগ করতেন। কতদিন চলেছিল, মনে নেই। শেষকালে সমরবাবুই হার মেনে খেলাটা ছেড়ে দিলেন, কী আর করবেন? সমরবাবুর বাড়িতে এখনও ছবিটি আছে দেখেছি।

১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা হয়, ১৯৪০ সালেই বোধহয় অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন শুরু হয়। এই সময়ে (আমার ঠিক বছরটা মনে নেই) ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে আমার স্বামী সুধীনবাবুর ডবলু. বি. ইয়েট্স্-এর রিশারকেশন নাটকটির অনুবাদ "পুনরুজ্জীবন" ওঁর বন্ধুবান্ধবীদের দিয়ে করান—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—গ্রীক, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—হিব্রু, বেবী গুপ্ত—সিরিয়ান, ধ্রুব মিত্র—যীশু, সুজাতা ও সুপ্রিয়া মুখার্জি ও আভা চট্টোপাধ্যায়—কোরাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুরারোপিত। আশুতোষ কলেজের একটি বড়ো ঘরে অভিনীত হয়—মঞ্চস্থ নয়, ইয়েট্সের নির্দেশ ছিল—দর্শকদের সঙ্গে সমান মেঝেতে অভিনীত হবে। যামিনীদা যীশুর জন্য একটি অপূর্ব মুখোশ এঁকে তৈরি করে দিয়েছিলেন—সেটা ধ্রুব মিত্র যীশু সেজে পরে এসেছিলেন—ওঁর লম্বা চেহারায় অপূর্ব মানিয়েছিল। অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর জন্য অর্থ তোলা হয়েছিল। তখন রামানন্দবাবু ছিলেন প্রেসিডেন্ট। যামিনীদা ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

১/১০-এর বাড়িতে আসার পরই আমার স্বামীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ছাপাবার ব্যবস্থা করে আমার ছোটো ভাই—প্রজ্ঞান (সুনু)। এই বইটির প্রচ্ছদ যামিনীদাই নিজে এঁকে দিলেন—মলাটের সব ব্যবস্থা যামিনীদাই করলেন। ছবিটি ছাপা হল ছাই রঙের তুলোট কাগজের মলাটের উপর—অর্ধেক বইয়ের মলাটে গাঢ় লাল রঙের ছবি। বাকি অর্ধেক বইয়ের হল গাঢ় নীল রঙের ছবি। এই তুলোট কাগজও যামিনীদাই যোগাড় করে দিয়েছিলেন, নিজেই—অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তরের প্রেস থেকে। এই মোটা কাগজে বেঁধে প্রেসের ছাপার কাগজ মুড়ে আসত—সেই কাগজের অপূর্ব সদ্ব্যবহার করলেন যামিনীদা। এর পর থেকে যখনই উনি যামিনীদার কাছে জানাতেন ওঁর বই ছাপা হবে, মলাটের ছবি চাই—অন্য সমস্ত কাজ স্থগিত রেখে, বইয়ের মলাটের ছবি আঁকা হত, এবং প্রয়োজন হলে, পটল বা পঞ্চানন ঠাকুরের হাতে পাঠিয়ে দিতেন। বেশির ভাগ সময়ে অবশ্য, আমার স্বামী নিজেই গিয়ে নিয়ে আসতেন।

১৯৪১ সালে জাপান যুদ্ধ নিয়ে কলকাতায় খুব ভীতি ছড়িয়েছিল। অনেকেই কলকাতা ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। অনেক স্কুল-কলেজ, যাঁদের সামর্থ্য ছিল, বাইরে নিয়ে গেলেন। যামিনীদা অনেক বছর ওঁর গ্রামে বেলিয়াতোড়ে--বাঁকুড়া শহরের কাছে—যান নি। দক্ষিণ কলকাতা থেকে বোধহয় উত্তর কলকাতাতে ভীতিটা বেশি হয়েছিল। যদিও দক্ষিণ কলকাতাও কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ ফাঁকা হয়ে গেল। ১৯৪১-এর শেষেই বোধহয়, না হলে ৪২-এর গোড়ায়—যামিনীদাও স্থির করলেন গ্রামে ফিরে যাবেন। সেখানে গিয়ে ঘরবাড়ি সারাতে হল, অর্থ-খরচও হল প্রচুর নিশ্চয়—কিন্তু স্বস্তি পেলেন কি? নিজের পরিবার নিয়ে নিরাপদে বেলেতোড়ে থাকবেন—এ ব্যবস্থাতে যামিনীদা কখনও সুস্থির থাকতে পারেন? এদিকে কলকাতা খালি হতে লেগেছে, স্কুল-গুলিতেও ছাত্রছাত্রীর অভাব হতে লাগল, তখন সব বিদ্যালয়গুলি ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসংস্থা সব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের আদেশ নিলেন—যেসব স্কুলের রিজার্ভ ফানডে ১২,০০০ টাকার বেশি আছে, সেই স্কুলগুলিই কলকাতায় থাকবে—যাঁরা বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন তাঁদের সুবিধানুযায়ী, তাঁরা যাবেন। বাকি সব আপাতত বন্ধ থাকবে। আমাদের স্কুলের অত রিজার্ভ ফানড ছিল না, কাজেই বন্ধ হয়ে গেল। কিছু শিক্ষয়িত্রী ছেড়ে দিলেন স্কুল, অন্য কাজ নিলেন, যাঁরা থাকলেন তাঁদের অর্ধ বেতন মনজুর হল, আমাদের স্কুলের ওই সামান্য রিজার্ভ ফানড থেকেই। যামিনীদা তখন আমার স্বামীর কাছে বারে-বারে লিখলেন—আমার দুই মেয়েকে নিয়ে আমি যেন অতি অবশ্যই যাই বেলেতোড়ে—থাকার সমস্ত ব্যবস্থা উনি করবেন। মায়ের (আমার শাশুড়ি) শরীর ভালো যাচ্ছিল না, ছোটো দেওর মাধবেরও স্কুল বন্ধ, শুধু কেশব—ওঁর পরের ভাই। আর আমরা ছিলুম ১/১০-এ। মা আর মাধবকে আমার ছোটো ননদ-ননদাই নিয়ে গিয়েছিলেন পুরুলিয়ায়—সেখানে আমার ননদাই সিভিল সার্জন ছিলেন—পুরুলিয়ার বড়ো হাসপাতাল ওঁর তত্ত্বাবধানে। আমার সাধারণত স্বাস্থ্য খুব ভালো হলেও, মাঝে-মাঝে বিগড়ে যেত—যেমন হল সেই বছরের গোড়ার দিকে। ফলে যামিনীদার আদরের নিমন্ত্রণ আমরা আনন্দের সঙ্গেই নিলুম—আমার ডাক্তারও বললেন এ ব্যবস্থা আমার পক্ষেও ভালো। আমার কেবল চিন্তা—আমার 'হাফ-পে'-তে আমি আমাদের খরচ চালাতে পারব তো, বেলেতোড়ে? পুঁজি বলতে তো আমাদের কিছু ছিল না। যামিনীদা চিঠিতে স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছিলেন:

'যদিও আপনি একদিন বলেছিলেন বৌমার স্কুল, এখন যাওয়ার অসুবিধা, তবু আমার আন্তরিক কামনা ছিল আপনারা এখানে আসেন, আপনি

অসুবিধার কথা লিখিয়াছেন, আপনিও জানেন আপনাদের জন্য আমার কোন অসুবিধা, অসুবিধাই মনে হয় না। তবে আপনার বা বৌমার যদি একটু বাইরের অসুবিধা হয় সহ্য করতেই হবে, আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করছি যাতে কষ্ট কম হয়, এখানে এর মধ্যেই খুব রৌদ্র হয়েছে, আর সঙ্গে একটা রাঁধবার লোক থাকলে ভাল হয় এখানে লোক পাওয়া যাচ্ছে না চেষ্টা করছি। আসবার আগে পত্র দিবেন, আমি পটলকে লোক সঙ্গে দিয়ে বাঁকুড়া স্টেশনে রাখব, যাতে কোন অসুবিধা না হয়। যে দিন রাত্রে গাড়িতে আসবেন তার ২ দিন আগে পত্র দিবেন কারণ এক-একদিন ছোট লাইনের গাড়ি ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছেড়ে দেয় কারণ আজকাল B. N. R.-এর গাড়ির খুব দেরী হচ্ছে বাঁকুড়া পৌঁছাতে। সেদিন কলকাতার ডাকও আসে না, কাজেই চিঠি একদিন দেরীতে পাই। হাওড়া স্টেশনে একটু আগে আসবেন, রাত্রি ৯-২০-টায় ট্রেন, এনকোয়ারি আপিসে জিজ্ঞাসা করবেন বাঁকুড়া আসবার ট্রেন কোন্ প্ল্যাটফরম থেকে ছাড়বে খুব সম্ভব ৭নং। রাত্রি ৩-টায় বাঁকুড়ায় পৌঁছায় সঙ্গে বি, ডি, আর রেলের ট্রেন প্রস্তুত থাকে, ৪৫ মিনিট লাগে আমাদের বাড়ি আসতে বেলিয়াতোড় স্টেশন বি, ডি, আর রেলওয়ে। বাড়ি আসতে স্টেশন থেকে ৫ মিনিট আন্দাজ লাগে। বি. এন. রেলওয়ে বাঁকুড়া পর্যন্ত ইনটার ক্লাস বোধহয় ৪ টাকা আন্দাজ টিকিটের দাম, আর বাঁকুড়া থেকে বেলিয়াতোড় পর্যন্ত নয় আনা। ৫০ টাকায় চলিবে কিনা লিখিয়াছেন, নিশ্চয়ই চলিবে। প্রথমটা একটু অসুবিধা হইবে সহ্য করিতে এই দুর্দিনে। তবে আমার যতটা সামর্থ্য ত্রুটি হইবে না। আজ অনেক চিঠি লিখতে হোল···বৌমাকে বেশি লিখতে পারলাম না, আমি এখনও গুছিয়ে উঠতে পারি নাই···

আপনাদের কথা মনে রেখেই ব্যবস্থা করছিলাম, তবে একটা কথা জানান দরকার: নাগরিক জীবনের একটু আধটুকু ত্রুটি থাকিলেও আন্তরিকতার অভাব হইবে না, আমি শুধু এই জন্য সাহস করছি এই দুর্দিনে স্বাস্থ্যনিবাসের সুবিধা ও আনন্দ না পেলেও সুবিধা-অসুবিধা মেনে নিতে হবে। আমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন বৌমাকে ও ছেলেদের আশীর্বাদ জানাচ্ছি। ইতি

আপনার যামিনীদাদা

এই চিঠিটির তারিখ ছিল ১৮।৩।৪২, তার উত্তরে আমার স্বামী ও আমি চিঠি লিখি। আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে যায় বোধহয় ফেব্রুয়ারির শেষে আমি একটু গুছিয়ে, এদিকের কিছুটা ব্যবস্থা করে, একজন রান্নার লোক যদি পাই এই ভেবে কিছুদিন দেরি করে ফেলি। নিজের শরীরটাও ঠিক ছিল না, আর যা হয় —ওঁর তো শরীর বরাবরই খারাপ, সেজন্যও চিন্তা করে হয়তো একটু বেশিই দেরি হয়ে গিয়েছিল। যামিনীদাকে আমি আমার ব্যবস্থার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলুম—তার জবাব আমার স্বামীকে লেখেন —কী অপূর্ব চিঠি :

শ্রীশ্রীহরি

বেলিয়াতোড়
২৩ চৈত্র

প্রিয়বরেষু

আজ বৌমার একখানি পোস্টকার্ড পাইলাম। গতকাল চিঠি লিখে রেখেছিলাম ডাকে দিতে দেরী হয়েগিছল, আজ সকালে বৌমার পত্র পেয়ে ভালই হোল। রাঁধুনী পাওয়া যায় নাই বলিয়া আসা হয় নাই, যদি নাই পাওয়া যায় আমরা তো রয়েছি আপনার বৌদিদির হাজার অসুবিধা ও শরীর খারাপ থাকলেও আপনাদের কষ্ট পেতে হবে এ কল্পনাতীত। আমি রাঁধুনীর কথা লিখেছিলাম, পেলে ভাল হয়, এ নয় যে রাঁধুনী না

হোলে চলবে না। এই বিপৎকালে সকলেরই একটু আধটু অসুবিধা হবেই। আমি সে কষ্ট নিতে অসুখী না। আপনাদের জন্য কষ্ট নিতে আনন্দ আছে। এটা আমি মৌখিক কিছু বলছি না, এখানের লোকের কাজ আমার পছন্দ হয় না তাই সেখানের লোকের জন্য লিখিয়াছিলাম। আর বৌমার স্কুলের যে মহিলাটীর কথা লিখিয়াছিলেন তিনিও আসিতে পারেন। অনেক চিঠি লিখিতে হইবে, তাই আজ ছুটী নিলাম। ভালবাসা গ্রহণ করিবেন।

ইতি—

আপনার যামিনীদাদা

আমার মতো বুদ্ধি থাকলে যা হয়—এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশদ বিবরণ সত্ত্বেও আমাদের বেলতোড়ে সে রাত্রের যাত্রা যা হল তার বর্ণনা দিতে আমারই লজ্জা করছে! আমার স্বামী ঠিকই লিখেছিলেন যামিনীদাকে যে আমরা ঠিকই পৌঁছে যাব। সবই ঠিক হল, কেবল বাঁকুড়া স্টেশনে যখন পৌঁছলুম, তখন আমার স্বামী বললেন আমায়—এখানে নামতে হবে। আমার সঙ্গিনী যিনি ছিলেন, তিনি জোর করে বললেন যে বাঁকুড়া স্টেশনটা ঠিক এরই পরে—তিনি ১২ বছর বাঁকুড়া স্কুলে কাজ করেছিলেন। কিন্তু তবুও দোষটা আমারই—আমার উচিত ছিল নিশ্চয়ই দরজায় গিয়ে স্টেশনের নামটা ভালো করে দেখা—কিন্তু তখনো এত অন্ধকার দূর থেকে পড়তে পারি নি। প্ল্যাটফরমটাও খুব খালি ছিল, গরম বলেই বোধহয়, ১৪/১৫ এপ্রিল নাগাদ—শেষ রাত্রি। এখনও সেই দৃশ্যটা ভাবলে আমার কান গরম হয়ে যায় লজ্জায়! যাই হোক, কিছু উপায় তো নেই, জোরে গাড়ি চলেছে বাঁকুড়া ছেড়ে হুহু করে বেরিয়ে অনেক বেলায় আদ্রা স্টেশনে এসে নামি। পটলকে পাঠাতে, বোধহয়, আমার স্বামী আগেই যামিনীদাকে বারণ করে দিয়েছিলেন, কষ্ট করে সে আসবে, সারারাত ওই গরমে থাকতে হবে তো স্টেশনে! যামিনীদাকে কী করে খবর পাঠানো যায় অনেক চিন্তা করেও কোনো কূল মিলল না! ফলে ওই স্টেশনে সারাদিন থাকা, কোনোক্রমে তিন বালতিই, বোধহয়, জল জোগাড় হল, কাকস্নানের জন্য। রেলওয়ে রেস্তরাঁয় (?) না ভুলেও গেছি—যা খাবার জুটল তাই খেয়ে চালানো হল, বিকেলে ফিরতি ট্রেনে আবার বাঁকুড়া, সন্ধ্যাবেলায় বেলেতোড়। সেখানে যা দৃশ্য দেখলুম, তাতে তো আমার লজ্জা কতগুণ বাড়ল বলে বোঝাতে পারব না—যামিনীদার চেহারা কী হয়েছে! কী যে হল আমাদের উনি কিছুই বুঝতে পারছেন না—এমনিতেই নার্ভাস লোক —ভয়ে দেখলুম, একদম মুখটা সাদা হয়ে গেছে! আমরা আসতে কোনো কথা না বলে, শুয়ে পড়লেন—যেন আরামে! উনি আমার বোকামির কথা বলাতে যামিনীদার আমার দিকে চাউনিটা জীবনে ভুলব না!! কিন্তু কী আর হবে—বউমার ক্ষমা মিলে গেল!! সে রাত যামিনীদার বাড়িতেই খাওয়া শোয়া, পরের দিন ভোরে নিজেদের ব্যবস্থা করতে গেলুম—জিনিসপত্র নিয়ে।

যামিনীদার আত্মীয় মহাপণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায়ের বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা। আমরা যেদিকে ছিলুম সেটি একতলা বাড়ি দক্ষিণমুখো, পুবে-পশ্চিমে ছুটো বড়ো-বড়ো ঘর, মাঝে দালান, একটা ছোটো ঘর আর স্নানের ব্যবস্থার মতো একটু জায়গা। বড়ো চারটে কুঁড়োতে (মাটির জালার মতো) ঠাণ্ডা জল ভরা, ঢাকা দেওয়া। সামনে খোলা সিমেন্ট বাঁধানো রোয়াক, একটু ফাঁকেই খড়ের চালের মাটির রান্নাঘর, কুয়ো, একটু দূরে সিমেন্টের তৈরি পায়খানা (খাটা) আর আরেকটা ঘেরা স্নানের জায়গা আর চৌবাচ্চা, যেমন বাইরের বাড়িতে হয়—সুন্দর পরিষ্কার ব্যবস্থা। আমরা একটা ঘর নিলুম, আমার সহকর্মীকে অন্যটা দিলুম। সেটাতে একটা তক্তপোশ পাতা ছিল। আমরা মাটিতেই ঢালাই বিছানা করতুম, সন্ধ্যাবেলায়,

দিনে শুয়ে থাকতুম, যেখানে ঠাণ্ডা পেতুম সেখানে—মাদুর পেতে।

এখন আমার মনে হয়, আমরা রান্নার লোক পাই নি বলে যামিনীদার বিশ্বস্ত প্রহ্লাদকে দিদি, আমাদের জন্য, ছেড়ে দিয়েছিলেন—উনি নিজেই রান্না করতেন, সুনীতি আর বড়ো বউমা (বিভা) সাহায্য করত—এখন আমার ভেবেই লজ্জা করছে। তখন 'খোকন' (দেবব্রত) ছোট্টো—জানালার শিক ধরে উঠত বসত—এই ওর খেলা ছিল !! খুব লক্ষ্মী সুস্থ ছোট্ট ছেলে!

প্রহ্লাদ কাঠের জ্বালে রান্না করত, পরে কিছু কয়লা জোগাড় করে দিয়েছিলেন যামিনীদা। এখন এইসব কথা ভেবে কী যে লজ্জা করছে বলতে পারি না! তবুও, এত অসুবিধা সত্ত্বেও, যামিনীদা জোর করে আমাদের বেলেতোড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, ঘোর গ্রীষ্মে—১৫ই এপ্রিল ১৯৪২, যখন ইউরোপের দিকে প্রচণ্ড লড়াই চলছে! পৃথিবীতে হুলুস্থুল! আমার "ইডিঅসি"-র কথা (ওডার-ক্যারেড টু আদরা !!) ছড়িয়ে পড়ল—সকলেই খুব হাসাহাসি করলেন। তখন ওঁর ও আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন বাঁকুড়ার ডিসট্রিক্ট জজ। উনি আমাদের গল্প শুনে ইরা-তারাদের নামে মজার ছড়া রচনা করলেন :

ইরা ইরা ইরানি
রাঙা মাথায় চিরুনি
ইরা যাবে তেহেরান
ওরা ভেবে হয়রান
পথ গেলো হারিয়ে
গাড়ি গেলো ছাড়িয়ে
এলেতোড় কেলেতোড় মেলেতোড়
পৌঁছুলো বেলেতোড়॥

তারা তারা তাতার
ঘুম আসে না তার
তারা যাবে বোখারা
বোঝে নাকো বোকারা
পথ গেলো হারিয়ে
গাড়ি গেলো ছাড়িয়ে
এলেতোড় কেলেতোড় মেলেতোড়
পৌঁছুলো বেলেতোড়॥

একদিন ওঁরা সবাই এলেন গাড়ি করে, যামিনীদার সঙ্গে দেখা করতে, আবার নিমন্ত্রণ করে গেলেন ওঁদের বাড়িতে সারাদিন কাটাতে। যামিনীদা আমাদের জন্য যা ব্যবস্থা করেছিলেন—আমি যে কী করে বোঝাব তা জানি না। প্রহ্লাদের কথা তো বলেই ছি—তাকে আমার প্রায় কিছুই বলতে হত না—তরি-তরকারি যা প্রয়োজন গ্রাম থেকে ঠিক তা জোগাড় হয়ে থাকত, রান্নার হাতও অপূর্ব। বেলেতোড়ে একটা জিনিস নানাভাবে সুস্বাদু করে রান্না করা যায়, আবার খুব সহজ ভাবেও—সেটা হচ্ছে পোস্ত। কতভাবে যে খেয়েছি এখন সব মনেও নেই! আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুন্দর সহজ ব্যবস্থা—আমাদের কুঁজোগুলিতে ভোরবেলায় কুয়ো থেকে জল তুলে দিয়ে যেত, বাইরের চৌবাচ্চাও ভরে দিত, বালতি বা অন্য বাসন সব ভরে রাখত—সে একটি বাউরী যুবক, নাম তার খুহু—সেও যামিনীদার একেবারে বিশ্বস্ত। তার কথা পরে আমি যামিনীদার কাছে জানলুম। আমার স্বামী তখন রিপন কলেজে কাজ করেন—কাজেই আমাদের পৌঁছে দিয়ে উনি কলকাতা ফিরে গেলেন। যামিনীদার কী মনে হল আগে তো গ্রামে আমরা কখনো থাকি নি, তাই কি? না, যামিনীদার বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ির মধ্যে ব্যবধান—খানিকটা ঘোরা গলি—যদি আমাদের রাত্রে প্রয়োজন হয়, জানি না ভয়ের কথা ওঁর মনে এসেছিল কিনা—আমার তো কিছু ভয় হয় নি কোনোদিনও, বা অসুবিধা বোধ করি নি! তবু কী সব সাত-পাঁচ ভেবে যামিনীদা খুহুর পিসিকে আমাদের বাড়ি রাত্রে পাহারা (?) দিতে বললেন। এত গরম ছিল তখন, আমরা সকালবেলায় খুহুকে দিয়ে আমাদের পুবের ঘরটাতে, নর্দমা বন্ধ করে, ইঞ্চি

খানেক উঁচু জল ধরে রাখতুম—ঘরটা খুব ঠাণ্ডা হয়ে থাকত। বিকেলে জলটা ছেড়ে ঝাঁট দিয়ে মুছে শুকিয়ে মেঝেতেই মাদুর পেতে তার উপর বিছানা পাততুম। দুপুরে ঢাকা দালানে মাদুর পেতে গড়াতুম। ইরা বেলেতোড়ে খুব আনন্দে ছিল,—যামিনীদার ছোটো ছেলে মণির সঙ্গে খুব ভাব, কোথায় যে দুজনে চলে যেত কাঁচা আম ইত্যাদির খোঁজে, আমরা কেউ জানতে পারতুম না। আগের দিকে ঝড় হয় নি, কিন্তু পরে শেষ রাত্রে বা ভোরে বা বিকেলে ঝড় হলে ইরা কোথায় পালাত, কতদূরে মণির সঙ্গে, হদিস আমরা কখনো পাই নি! কিন্তু বেলেতোড়ের গরম তারার পক্ষে কষ্টকর হয়েছিল। ওর বাবার মতো, ওরও হীট ফিভার হত। তা ছাড়া তারা ওর বাবার খুব ভক্ত—যাকে আমরা বলি ন্যাওটো—উনি চলে গেলেই ঘ্যানঘ্যান করত, জ্বর হয়ে যেত, কিছু খাওয়াতে পারতুম না, পরে আমাশা হয়ে বেশ কষ্ট পেত। সেজন্যও, বোধহয়, যামিনীদা খুহুর পিসিকে আমাদের দেখতে পাঠিয়েছিলেন। এক সন্ধ্যায় ওইরকম বিছানায় বসে তারাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছিলুম, এমন সময়ে সিঁদুরের মতো লাল টকটকে ইঞ্চি তিনেক লম্বা চওড়া, প্রায় গোলাকার, একটা কাঁকড়াবিছে আমাদের সাদা চাদরের উপর দিয়ে দিব্যি চলে আসছিল—তারাই আমাকে হাত দিয়ে দেখাল—মা, দেখো! আমি ভয় পেয়ে প্রহ্লাদকে ডাকলুম—ও বলল সাংঘাতিক বিষাক্ত কাঁকড়াবিছে! কী করল সেটাকে, আমার মনে নেই, কিন্তু তারপর থেকে আমরা নর্দমার মুখে বড়ো একটা ইট চাপা দিয়ে রাখতুম। সাপ-বিছের দেশ, আর ওই গরম বটে, কিন্তু আমাদের বাড়ির চারপাশটা এমনিতে পরিষ্কার ছিল, আর কোনো দিন, অমন ভয়ের ঘটনা হয় নি। যে রাত্রে আমার স্বামী ফিরে গেলেন কলকাতা, সেই রাত থেকেই খুহুর পিসি আমাদের বাড়িতে এল, সন্ধ্যাবেলায়। কিছুতেই খেল না, আর ইরা-তারাদের শুইয়ে যখন আমি শুতে গেলুম, খুহুর পিসিকে বললুম—'তুমি আমার পাশে শুয়ে পড়ো।' কিন্তু সে কথা মোটে কানেই তুলল না—আমি হ্যারিকেনটা কমিয়ে, দরজার ধারে রেখে, শুয়ে পড়লুম, ও বসে-বসে অনর্গল কথা বলতে লাগল, এক মুহূর্তও থামল না! আমি কী করি? সারাদিন ঘুরেছি ফিরেছি, কিছু কাজও করেছি, প্রচণ্ড গরম, তাই ক্লান্ত লাগছে, ঘুম পাচ্ছে—মাঝে-মাঝে ঝিমোচ্ছি, কিন্তু খুহুর পিসির কথা থামছে না! ভোর হতেই আমাকে ডেকে দিয়ে, বেলেতোড়ের কথার টানে বলল—'মা, আমি যাচ্ছি, সন্ধ্যায় আসব।' আমি কী বলি? ওকে ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে, ভোরবেলার ঠাণ্ডায় আরামে চট করে একটা ঘুম দিয়ে নিলুম! সন্ধ্যায় আবার খুহুর পিসি ঠিক হাজির, কিন্তু খাবে না কিছুতেই। আর, সারারাত সেই বকর-বকর। তারই মধ্যে আমি একটু ঘুমিয়ে পড়ছি, ওর কথায় আবার জাগছি—আবার ঝিমোচ্ছি! একবার মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—সারাদিন তুমি কী করেছ? সমস্ত দিনের কাজের কথা ও বলে গেল! আমি অবাক হয়ে ভাবলুম—ওর বিশ্রামটা কখন হবে? যদি, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, ও এমনি করে কাটায়! আমার প্রশ্নের উত্তরে সে আমাকে ওদের পরিবারের ইতিহাস বলে দিয়েছে—খুহু ওর একমাত্র ভাইয়ের একমাত্র ছেলে। ভাই ভাজ দুজনেই অল্প বয়সে মারা যায়, খুহুকে পিসিই মানুষ করেছে। স্কুলে লেখাপড়া শিখতে দেয়—পিসির খুব শখ খুহু ম্যাট্রিক পাস করে, পোস্ট আপিসে পিওনের কাজ করে। খুহু অসাধারণ ভালো ছেলে—স্কুলে মাস্টারমশায়েরা ওকে খুব ভালোবাসতেন, সাহায্য করতেন, এবং খুহু ম্যাট্রিক পাস করেছে। এবং পিসির স্বপ্ন সফল হয়েছে, এই ক'মাস আগে ওকে পোস্ট আপিসের পিওন নিযুক্ত করা হয়েছে! পিসির শখের স্বপ্ন সফল হয়েছে! ক'জনের এরকম হয়? পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—মুখটা যেন আনন্দে বিভাসিত! খুহুর

পিসিকে আমি সেদিন বললুম: দেখো, তুমি যে এত কথা বল, সারারাত ধরে—তোমার ক্লান্তি লাগে না? ও আমার কথা শুনে যেন অবাক হয়ে গেল। যেন বলল—ও কী কথা? আমি তবুও বললুম—সারাদিনের কাজের পর তোমার ঘুমুতে ইচ্ছা করে না? আমি তো জেগে থেকে তোমার গল্প শুনতে পারি না—আমার ঘুম পায়! তুমিও ঘুমোলে আমাদের দুজনেরই বেশ আরাম হয়।—পিসি অবাক হয়ে গেল—'বাবু যে আমাকে বলেছেন রাতে তোমাকে দেখতে। আমি ঘুমিয়ে পড়লে তো তোমাকে আমার দেখা হবে না। বাবুকে আমি কী বলব?'—বুঝতে পারলুম ওর সমস্যা। বেচারা পিসি—বেচারা আমি! ও সারা রাত না ঘুমিয়ে বকবক করে আমাকে দেখছে, বাবু যে হুকুম ওকে দিয়েছেন সেটা তো ওকে পালতে হবেই—তাতে ওর ঘুম বা বিশ্রাম হোক বা না হোক। বাবুর হুকুম ওকে মানতে হবেই, যে করেই হোক। পরদিন ভোরবেলা ইরা-তারাদের খাইয়ে, বিছানা তুলে, আরেকটু কাজ সেরেই, ইরা-তারাদের সঙ্গে নিয়ে যামিনীদার বাড়ি গেলুম। অত সকালে গেছি দেখে যামিনীদাও একটু শঙ্কিত: 'কী হয়েছে, বউমা, এত সকালে? সব ঠিক আছে তো?' ইরা-তারাদের ছবি আঁকতে বসিয়ে দিয়ে, আমি যামিনীদাকে খুচুর পিসির ইতিবৃত্ত সব বললুম, আরো—'যামিনীদা, আপনার অর্ডারটা একটু পালটে দিতে হবে। সারারাত ও আমার কাছে থাকবে—আপনি বলে দেবেন ও যেন খায়ও, আর আমাদের ঘরে ঘুমোবে। প্রয়োজন হলেই আমি ওকে ডেকে তুলে ওর সাহায্য নেব। আপনার ওই অর্ডার—"ও আমাকে দেখবে"—এটা বদল করে দিতে হবে।' যামিনীদা, শুনেছিলুম অনেক কষ্টে ওকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে আমাদের কাছে শুলেই আমাদের 'দেখা'-র কাজটাও হয়। এইরকম ছিল আমাদের দেশের লোক—দেখে আমি চমৎকৃত না হয়ে পারি নি॥

আরেকটা সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের, বেলেতোড়ে। গ্রামে যামিনীদা আমাদের প্রয়োজনমতো দুধের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাই পাশের ছোটো আরেকটি গ্রাম থেকে আমাদের দুধ আসত। ছোটো একটি ছেলে একটি ঘট করে, বই শ্লেট নিয়ে, আমাদের জন্য ভোরবেলা দুধ এনে দিয়ে বেলেতোড়ের পাঠশালায় পড়তে যেত। বেলা এগারোটা নাগাদ সে ফিরে এসে ঘটিটি নীরবে তুলে নিয়ে চলে যেত। আমরা দু মাস বেলেতোড়ে ছিলুম—কোনো দিন সে দুধ আনে নি, এমন হয়নি, বা মাপে দুধ কম হয়েছে, বা দুধ খারাপ হয়েছে—প্রতিদিন এই দুমাস আমাদের বরাদ্দ দুধ আমরা পেয়েছি। যদি কোনোদিন বেশি দুধ চেয়েছি, সে দিদিকে বা যামিনীদাকে আগে বলেছি, এবং পেয়েছিও। পয়সাকড়ির বিষয়েও কোনো কথা তো নয়ই—না বল্লেই চলে! বেলেতোড়ে পোকা-মাকড় তো দেখেছি, শুনেছিলুম সাপের কথা, কিন্তু আমি কোনো দিনও দেখিনি। আমার স্বামী ১৯৪২-এর পুজার একটু আগেই জন আরুইনকে নিয়ে আবার বেলেতোড়ে গিয়েছিলেন, তখন সাপুড়ে ডেকে বড়ো বিষাক্ত সাপের খেলা 'জন'-কে দেখানো হয়েছে, শুনেছি,—ছবিও দেখেছি! যামিনীদা তখন, শুনেছি আমার স্বামীর কাছে, পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেন আর ডাকতেন, ও বিভূবাবু, ওদের ছেড়ে দিন—আর নয়, জনকে নিয়ে আপনি এ ধরে চলে আসুন!' বেলেতোড়ের পাশেই একটা ছোটো নদী চলে আঁকে-বাঁকে—আমরা একদিন গোরুর গাড়ি চেপে সেটার হাঁটুজল দেখতে গিয়েছিলুম, যামিনীদার সঙ্গে। সেদিন আমি একটা শাড়ি পরেছিলুম, একজন ঢাকাই-ওয়ালা আমাকে ঢাকাই শাড়ি দিয়ে যেতেন তখন কলকাতায়। (আমার স্বামীরও এবং আমারও ঢাকাই শাড়ি খুব পছন্দ) একবার খুব ভালো ঢাকাই একটা থান এনে দিয়ে অনুরোধ করলেন কিনতে—বাবুর জন্য একটা পানজাবি করে দেবেন, বাকিটা আপনি একটা পাড় লাগিয়ে, শাড়ি করে পরবেন। তাই করা হল, আমার

স্বামী শাড়িটার জন্য কোথা থেকে যেন একটা সুন্দর নকশা-করা সবুজ রঙের পাড় কিনে এনে দিলেন—সবুজ রঙ আমার ফেভারিট ছিল। বেলেতোড়েই বসে-বসে আমি থানটাতে লাগিয়ে ফেলি। যেদিন ছোটোনদী দেখতে যাই সেদিন সেটা পরেছিলুম—যামিনীদার চোখ এড়ায় নি, সুন্দরের তপস্বী—'খুব সুন্দর শাড়িটা তো, বউমা, পাড়টা খুব ভালো। কোথায় পেলে?' আমি খুশি হয়ে বললুম, উনি কিনে এনে দিয়েছেন। এখানেই বসালুম। ছোট্ট বিষয়—কিন্তু এইসব ছোটো ঘটনা দিয়েই মানুষ চেনা জানা হয়, না? গোরুর গাড়িতে বসে-বসে যামিনীদা আমায় বললেন—'ভাবো, বউমা, বৃত্তর কথা। চাকা জিনিসটা যে আবিষ্কার করেছে, তার কত বুদ্ধি!' যেতে-যেতে মাঠ ধানখেতের পাশ দিয়ে, আমায় বললেন—'দেখো, এই চাষ করার কাজ কী কষ্টের, কী বীরত্বের! পৃথিবীর মধ্যে মনে হয় চাষাদের এই কাজ—সবথেকে বীরত্বের কাজ—সবচেয়ে কঠিন—রৌদ্রে জলে ঝড়ে কোনো বিশ্রাম তো নেই।' —পরে সমারসেট মমের এই এক রকমের মন্তব্য পড়ে আমরা আনন্দিত হই অল গ্রেট মাইনড থিংক অ্যালায়িক। নদীটা দেখে রবীন্দ্রনাথের "ছোটো নদী"-র সঙ্গে তুলনায় ছবছ মিলে গেল তার উঁচু দুই পাড় দেখে—বর্ষায় তার রূপটি স্পষ্টই বুঝলুম। আরেকদিন হাঁটতে-হাঁটতে দেখলুম—উদার প্রান্তে দাঁড়িয়ে সুসুনিয়া পাহাড়—যেখানে পাহাড় চড়ার শিক্ষা, এখন দেওয়া হয়। বেলেতোড়ে থাকতে-থাকতে আরেকজনকে চিনলুম—যার আবির্ভাব সপ্তাহে একদিন করে হতই। যামিনীদা ডাকতেন "মহারানী" বলে—মহামান্য প্রয়োজনীয়! খুব হাঁকডাক পেড়ে আসতেন—জমাদারনি! দারুণ চেহারা আর পার-সোন্যালিটি—সকলেই আদর করে ডাকতেন, খাওয়াতেন, মিষ্টি করে কথা কইতেন এবং গ্রামের সব বাড়ি তিনি 'সাফ' করে দিয়ে যেতেন—তাঁকে ছাড়া গ্রাম সাফা রাখা কষ্টকর, সবাই বুঝতেন! আরেক-জনও মাঝে-মাঝে আসতেন—তিনি মেছুনি। ছোটো মাছ ছাড়া বড়ো পুকুরের সুস্বাদু মাছও আমরা মাঝে-মাঝে তাঁর কল্যাণে পেতুম—যে মাছের স্বাদই আলাদা।

যামিনীদার একটা বড়ো রকমের গর্ব ছিল বেলেতোড় বিষয়ে—এ গ্রামের এমন ব্যবস্থা, সৈন্য দিয়ে ঘিরিয়ে রাখো তিন মাস বা আরো বেশি—গ্রামের মানুষ ঠিক থাকবে—তাদের নিজেদের খাদ্য মজুত আছে। প্রত্যেকের বাড়ির সঙ্গে ছোট্ট একটি তরিতরকারির বাগান—ধানের খেতের কথা বাদই দিচ্ছি—নিজেদের প্রয়োজনমতো আলু, পেঁয়াজ, শাক ইত্যাদি তো প্রতি বাড়িতেই আছে স্টক, তাছাড়া তো আছে—পোস্ত, যা নানাভাবে রান্না করে খাওয়া যায়—পুকুরে নদীতে মাছ—গ্রামে অনেকেরই গোরু আছে,—ঠিক সেরকম অভাব আমারও মনে হয়েছিল, যেন কারুরই নেই! গরমে কষ্ট, শীতে ঠাণ্ডা—এ তো প্রকৃতিরই নিয়ম, যামিনীদা বলতেন,—আমাদের সকলকেই সহ্য করতে হবে! তা ছাড়া আছে তো পুজাপার্বণ। এ কথা বলতে যামিনীদা যেন উল্লসিত হয়ে উঠতেন। দেখো, বউমা, আমাদের গ্রাম্যজীবন গতানুগতিক—রোজ কাজ আর কাজ আর কাজ! সেইজন্যই তো একটু বদল চাই—তাই তো পুজাপার্বণের উদ্ভব—তাতে সৃষ্টির কাজও সুন্দর হয় উৎসাহে,—আর সমস্ত গ্রাম জুড়ে একটা আনন্দ উৎসব হয়, নতুন করে কাজ করার প্রেরণা আসে। তাই না? দেখো, প্রতি পুজাতে কত লোককে জড়িয়ে ফেলা হয়—সব স্তরের লোক যে চাই—মৃত্তি গড়া থেকে আরম্ভ করে, মাটি, খড়, ঢাক-ঢোল, ফুল-ফল, গাছ-গাছড়া—বামুন ঠাকুর তো আছেনই। বাড়ির মেয়েদেরও অনেক কাজ, কিন্তু সে নতুন ধরনের কাজ, নতুন অনুপ্রেরণা নিয়ে সবাই মিলে—তার খাটুনিও আছে। কিন্তু আনন্দ আলাদা—নতুন জীবন সঞ্চার করে। পুরোনো একঘেয়ে কাজ থেকে—অল্প দিনের জন্য রেহাই। আর সব কাজ সুন্দরভাবে

সম্পন্ন হয়ে গেলে—যায়ও ঠিকই—সে কী আনন্দ, কী তৃপ্তি। এই রকম করেই আমাদের গ্রাম্য জীবন সকলকে জড়িয়ে নিয়ে মিলেমিশে সে কী আনন্দের সঙ্গে চলত! ভাবো তো! ধর্মেই আনন্দ ধর্মই তো জীবন, ধর্মই তো যার-যার কাজ—ঠিক করে করা, জীবনই তো ধর্ম—ধর্ম মানে কী? জীবনেই তাই আনন্দ, আনন্দ শিল্পে কর্মে—সৃষ্টিতে—এই তো আমাদের সহজ সরল জীবন।—আমার ঠিক ওঁর সব কথাগুলি মনে নেই—তাৎপর্য এইরকম—কতভাবে কত সকালসন্ধ্যা আমায় বুঝিয়েছেন, আমিও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছি। এই গ্রামের মধ্যে থেকে (অনেক সুবিধার মধ্যেই, আমার পক্ষে নিশ্চয়ই, যামিনীদার ব্যবস্থাপনার জন্য) মনে হত, সত্যি, এইভাবেই তো কত যুগযুগান্তর ধরে আমাদের বাঙলাদেশের এই ধারা প্রবাহিত! খুব সুন্দর লাগত, যামিনীদার কথাগুলি। গ্রাম্য সরল জীবন যে কত সুন্দর আমি বুঝতে শিখেছিলুম, যামিনীদার কাছেই। সকলকে নিয়ে মিলেমিশে থেকে জীবনযাত্রা—সেটাই ছিল বাঙলার গ্রামের জীবন। বেলেতোড়ে আরেকজন আশ্চর্য মানুষ দেখেছিলুম—গ্রামের প্রাণ-স্বরূপ—ডাক্তারদাদা। তারা—আমাদের ছোটো-মেয়ের দরুনই তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ। তারার বেলেতোড়ের গরমে খুব কষ্ট হত আর ওর বাবার জন্য হেদোত ঘ্যান-ঘ্যান, শরীর খারাপ, জ্বর, আমাশা—কিছু খাবে না—কী যে মুশকিল তাকে নিয়ে! যামিনীদা ডাক্তারদাদাকে আনলেন—দারুণ দরদি সমঝদার মানুষটি—ওষুধ দিয়েছেন, পথ্য পাল্টে-পাল্টে দিয়েছেন—সর্বদা হাসিমুখে সাহস দিয়ে গেছেন। আমিও অনেক সময়ে তারাকে কোলে নিয়ে ওঁর বাড়ি থেকে ওষুধ এনেছি। ডাক্তারদাদার বাড়িতেও দেখেছি, গ্রামের অন্য সব বাড়িরই মতো খাটের তলায় আলু পেঁয়াজ (বোধহয় রসুনও) বিছানো। তাই যামিনীদার গর্ব—বেলেতোড়কে আক্রমণ করলেও ওঁর গ্রাম তিনমাস তো নিশ্চয়ই—আরো বেশিও—শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে—খাবারের অভাব হবে না। যামিনীদার কথাগুলি বেশ মজার ছিল—হাসাবার জন্যই অনেক সময়ে এই রসিকতাগুলি করতেন, জানি, তবে হয়তো ওঁর মনেও একটু ভয়ও মিশ্রিত থাকত। যেমন: 'বউমা, আমরা তো ভেবেছি বেশ পালিয়ে এসেছি জাপানিদের আক্রমণ থেকে। কিন্তু জান, তবু জাপানিরা ইচ্ছা করলেই আমাদের আক্রমণ করতে পারে—বেলেতোড় বাঁকুড়া থেকে ১২ মাইল, দুর্গাপুর থেকেও ১২ মাইল আবার সোনামুখীও তাই। বলতে পার পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু! বুঝলে না? বললেন হেসে। আরো সুন্দর কথা বলতেন, গরমে কষ্ট হচ্ছে দেখে—বউমা, আমরা গরম বলে কাৎরাচ্ছি! ভাবো, ওরা যুদ্ধ করছে—কেন করছে জানি না, বুঝি না—কিন্তু গোলা কামান বারুদের গরম—বিপদ তো আছেই তা ছাড়া, —মৃত্যু! আমাদেরও তো তাদের সেই কষ্টের, সেই উত্তাপের কিছু ভাগ নিতে হবে। সে তাপ তো আমাদের অবশ্যই স্পর্শ করবে—পৃথিবীর তো একটাই বায়ুমণ্ডল! আমরা পালাব কোথায়? এও আমাদের ভোগ করতেই হবে। এই অছায়ে আমাদেরও ভাগ আছে, সে দায়িত্ব এড়ালে চলবে না—আমাদের নিতেই হবে।' যামিনীদা খুব মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত ছিলেন। এক সময়ে আমিও ছিলুম! কিন্তু ইদানীং কালে সব সময়ে কী করেছেন, কী বলেছেন, বুঝতুম না, মানে নিজের মনে সমর্থন পেতুম না। আমাকে যামিনীদা সহজ সরল করে বুঝিয়ে দিতেন। আমি সে সময়ে কত যে শিখেছি যামিনীদার কাছে, এখনও সবটা উপলব্ধি করে উঠতে পারি নি—সহজে আমার ভিতরে সেটা চলে গেছে! প্রায় প্রতিদিনই সকালে যামিনীদা আমাদের বাড়িতে আসতেন, কিছুক্ষণ থেকে কথা বলে চলে যেতেন—পটল ওর মজার খবর নিয়ে এসে আমায় একটু ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা করত, মজা করেই, আমিও মজা করে সেটা মেনে নিতুম।—বা, কোনোদিন ইরা-তারাকে নিয়ে আমিই যামিনীদার বাড়ি যেতুম। ওরা ছবি আঁকত, বা একটু পড়াশোনা করত, মণিও—তবে বেশি নয়—ছবিই আঁকত—যামিনীদা সেগুলি রেখে দিতেন। বা বিকেলে কাজ সেরে আমরা যেতুম—যামিনীদার কুয়োর কাছে একটা বড়ো গাছ ছিল, অনেক সময়ে তার ছায়ায় বসে গল্প করতেন, মাঝে-মাঝে লাঠিটা নিয়ে গ্রামের দিকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন—এক দিন ওঁদের বড়ো বাড়িটার দিকে—সুজনদিদি, বিজনদিদি (যামিনীদার দুই বোন) কী সুন্দর আলপনা দিতেন, অনেক সময়ে নানা রঙ দিয়ে। বিশিষ্ট পুজোয় বা বিয়েতে, বা অন্য অনুষ্ঠানে নানা চিত্রের ও ধরনের আলপনা দিতে হয় (আমি জানতুম না)—ওঁরা সব জানতেন—কী অপূর্ব, কিন্তু কী সহজে আঁকা। বড়ো হাঁড়ি বা কলসী, বা কুঁড়োর গায়ে নানা ছবি আঁকা—যেমন যামিনীদাও করেছিলেন, দেখেছি পরে, কলকাতায়। আশ্চর্য একটা কাজ যা আমি আগে কখনও দেখিনি, বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে কাগজের উপরে বিচিত্র অপরূপ ডিজাইন আঁকা। শুনেছি, এই শিল্পকাজে আশ্চর্য পারদর্শী ছিলেন যামিনীদার বাবা নিজেই—নানা ধরনের নকশা তিনি করতেন। দিদিরাও ছোটো-ছোটো নকশা এঁকে দেখাতেন কোনো পুজোতে বা বিয়েতে কী রকম আলপনা আঁকতে হয়—আমি তো অবাক হয়ে দেখতুম—নিজের দেশের বিষয়ে কতটুকুই বা জানি! যামিনীদা বলতেন, এই সুন্দর সব কাজই এই শিল্প, এই তো ধর্ম—এই তো আমাদের দেশ। সকলকে নিয়ে মিলেমিশে থেকে যে জীবনযাত্রা—সেই তো ছিল বাঙলার গ্রাম্য জীবন। [ক্রমশ

১ যুদ্ধের সময় ব্যাফল ওয়াল করে ঘরদোর নিরাপদ করা হয়েছে, সব ছবি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই ছবিটি আমি নামাতে দিই নি—মরলেও আমাদের সঙ্গেই মরবে, এই আমার মনের কথা ছিল।

রচনায় উল্লেখিত ব্যক্তিদের পরিচয়:
আমার স্বামী—বিষ্ণু দে; সুধীনবাবু—কবি ও প্রাবন্ধিক, "পরিচয়"-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; চঞ্চলবাবু—বিষ্ণু দে-র প্রতিবেশী চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিদগ্ধ সমঝদার; সমরবাবু—কবি এবং সাংবাদিক সমর সেন।

সেই দেখা আর এই

অরুণ মিত্র

তোমার সঙ্গে দেখা হল কখন কবে,
অনেক কাল আগে, না আজ সকালেই ?
সকালের সোনা গাছে-গাছে দরজায় জানলায়
রাস্তাটা ফুটফুট করছে
আমার পাশেই একটা নরম ডগায় কুঁড়ি,
তখনি তোমায় দেখতে পাই
আর আমরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি স্রোতের মাঝখানে।
হর্ন বাজছে চাকা ঘুরছে অগুনতি
হুইসল শুনছি আর খটাখট খটাখট জোর কদম,
গাড়িভরতি হাসি
রং উড়ছে কাপড়চোপড় ঝল্‌কাচ্ছে
হাসি ঠিক্‌রোচ্ছে শড়কের পাথরে পাথরে
হোহো ওহোহো হোহো,
শুনতে-শুনতে শুনি গলার স্বর ভাঙছে
বেলা বাড়ছে হাহা হাওয়া
হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে হা-য় হা-য়।
আমার পাশে কই তুমি
এই পড়ন্ত বেলার যাত্রায় ?

হঠাৎ আমি দুই পাহাড়ের ঘেরপথে,
শব্দ নেই শুধু পায়ের তলায় কখনো একটু টলমল
সামনে কোথাও যেন ধস নামছে।
একটি কথার জন্যে আমার কান পাতা
কিন্তু কথা নেই, চারধার ঝিমঝিম,
আমার নিশ্বাস অন্ধকার জড়িয়ে-জড়িয়ে
ফাটলের লতাগুল্ম জড়িয়ে-জড়িয়ে
রাতের ওই চৌকাঠে থম্‌কানো ছায়ার দিকে
আমি সেই ছায়াকে চোখ দিয়ে টানি,
ধ্বনি থেকে দূরে আলো থেকে দূরে তোমার মুখ,
তোমার সঙ্গে অনেক আগের দেখা-হওয়া।

কবে আমরা চোখের সব জল উজাড় ক'রে
সোনালি ফোয়ারা তুলব মাটি থেকে,
সকালের তোরণ পার হয়ে

তার আভায় রাত ঘিরব
কবে আমাদের সকালের মুখদেখা
অনেক আগের দেখায় ঝমঝম করবে
আর সন্ধের পাষাণ বাজাবে ঘুরে-ঘুরে ?

শীতপ্রহর

মদ্যপ শরীর শুয়ে আছে সড়কের পাশে
বিরক্ত কোরো না তাকে বরং এসো তার জন্য প্রার্থনায় বসি

ধ্রুব দে

আর এইভাবে কোনো দিন যদি ঘুম ভাঙে
এই চলমান পিছুহটা থেকে এই মধ্যরাতে
খোলসে জড়িয়ে খোলস ক্রমাগত বিলাপের থেকে

জেগে উঠে যদি এ ভূমি বাস-অযোগ্য মনে হয় তার
যদি সব আত্মগত্য সব দোলাচল ছুঁড়ে পা বাড়ায়
তোমরা ডেকো না আর

তার এই যাওয়া রৌদ্র মাখামাখি সেই গল্প ছুঁয়ে
আরও কিছু শীতপ্রহর আমরা রইব বেঁচে

রক্ত-পদচ্ছাপ

ভারতবর্ষের এক কবি সুবর্ণরেখার জন্মে বিভোর

রেজাউদ্দিন স্টালিন

তার সামনে দেয়া হয়েছে তারই সন্তানের রক্তমদ
একবার সে ভাবতে চেয়েছিল পানপাত্রের উৎস বিষয়ে

জন্মান্ধের এই দেশ তাকে তাড়িয়ে আনল সকল
ঔৎসুক্য থেকে
একবার তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল
পানপাত্রের ভেতরোত্থিত কান্নায়
জন্মান্ধের এই দেশ তাকে বুঝিয়ে দিল সবই
কেবল মায়া

রক্তমদের নেশায় কবি যখন সত্যভাষণে ব্রত হল
আর উচ্চারণ করতে থাকল সব প্রিয় পুত্রদের নাম
জন্মান্ধের এই দেশ তাকে সরিয়ে আনল সংসারের
সব স্বপ্ন থেকে
এবং ইন্দ্রজাল বলে গণ্য হল সব সত্যভাষণ

নিঃশেষিত পেয়ালা আবারও জেগে উঠছে রক্তফেনায়
পাশের প্লেটে কাবাবের গন্ধে কবি উঠে দাঁড়াতে চাইল

তার প্রিয়ার শরীরের গন্ধের মতো মনে হচ্ছে।
জন্মান্ধের এই দেশ তাকে বসিয়ে দিল :
কবি-মহাভারতে হরিণের মাংস বিরল নয়

সুবর্ণরেখার জন্মে বিভোর তার পানপাত্র থেকে
উপচে-পড়া রক্তমদ ভিজিয়ে দিচ্ছে পায়ের পাতা
এখন টলতে-টলতে সে ঘরে ফিরতে চায়
জন্মান্ধের এই দেশ বলল—পৃথিবীর সর্বত্রই
তোমার ঘর
তুমি আর ঘরে ফিরে কী করবে?

তবু কবি হাঁটতে থাকল
পেছনে তার এলোমেলো দীর্ঘ রক্তপদচ্ছাপ।

কলকাতায় বৃষ্টি

বাসুদেব দেব

একপশলা বৃষ্টিতেই বিকল কলকাতা
বানচাল প্রগতিশীলতা জ্যামজট রাগদুঃখ আস্ফালন
স্নায়বিক চূড়ান্ত টেনশন
ভেসেছে কাগুজে নৌকো সারে-সারে গলিতে রাজপথে
মনীষা চলেছে ঘোলাজলে

জলে ভেসে যায় ইশতাহার
ডুবে যায় ম্যানহোলে ঈষৎ প্রমত্ত বোকা ঘরে-ফেরা দিন
সাবধান খুব সাবধান
মেঘ নিংড়ে ঝরে অন্ধকার বস্তিতে আমোদ-শিল্পে
কাগজের অপিসেও শিক্ষিত বাস্তুড় ঢোকে জল
ভিজে বেড়ালের মতো গেরস্থের ঘরে ভেজে কাক ট্রাফিক পুলিশ
খোলা বারান্দায় এসে ছুটি চায় ছুপুর ইস্কুল
ভুল বানানের মতো জানালায় ফুটে থাকে ওই
রুগ্ন মেয়েটির ছুটি ছলছল চোখ
মনীষা চলেছে ঘোলাজলে

একপশলা বৃষ্টিতেই চরাচর বিদ্যুৎ-বিরত
বসুদেব নামেন যমুনাগর্ভে
মেট্রো রেলে বেঁচে থাক ছবি ও কবিতা
তিন শতাব্দীর এই অভিমানী গরিমাও আজ
পর্দা ঢাকা রিকশয় ইজ্জত বাঁচান
নিজ ডালে এখনও কুড়ুল কালিবাবু
সর্দিজ্বরে কাবু স্মৃতিলতা
কোথায় ইলিশ প্রিয় হাতে জুতো প্রতিবাদ মানে প্রতিক্রিয়া
রাত্রিদিন একাকার ভালোমন্দ মাইনে ও মহার্ঘ্যভাতা
মনীষা চলেছে ঘোলাজলে

জন্মশতবর্ষে এস. ওয়াজেদ আলি

অলোক রায়

এস. ওয়াজেদ আলির (১৮৯০-১৯৫১) জন্মশতবর্ষে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করা গেল, একালের বাঙালি তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। হয়তো তাঁর নামটুকু মাত্র জানা আছে কারও-কারও, কিন্তু ছাত্রজীবনে পাঠ্য বইতে পড়া একটি রচনা ছাড়া ('সেই tradition সমান চলেছে, কোথাও তার পরিবর্তন ঘটে নি।' —ভারতবর্ষ), তাঁর অন্য কোনো রচনার সঙ্গে একালের বাঙালির পরিচয় আছে বলে মনে হল না। তাই আনুষ্ঠানিকভাবেও এপার-বাঙলায় জন্মশতবর্ষে তিনি অনালোচিত থাকলেন। অবশ্য এস. ওয়াজেদ আলির অধিকাংশ বই দীর্ঘদিন অমুদ্রিত থাকায় তাঁর রচনার সঙ্গে অনেকেই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগবঞ্চিত। বাংলাদেশে কয়েক বছর আগে সৈয়দ আকরম হোসেনের সম্পাদনায় দুই খণ্ডে 'এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী' (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বইটি পশ্চিমবঙ্গে আদৌ সহজপ্রাপ্য নয়। অথচ বিশ শতকের বাঙালি মনীষার আলোচনায় এস. ওয়াজেদ আলির নামোল্লেখ অপরিহার্য। শাণিত বুদ্ধি, প্রসন্ন মানসিকতা ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে তাঁর প্রবন্ধে, আর সেইজন্যই তাঁর প্রবন্ধগুলি দীর্ঘ-দিনের ব্যবধানেও মূল্যবান ও উপভোগ্য মনে হয়। প্রবন্ধ ছাড়া ছোটোগল্প ও রম্যরচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর *Aligarh Memories and a Persian Boquet* দেখার সুযোগ পাই নি, কিন্তু প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সঙ্গে তিনি র‍্যাশনালিসটিক সোসাইটির বুলেটিন সম্পাদনা করতেন এ খবর জানা আছে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে মনে হয় "সবুজপত্রে" লেখা (অতীতের বোঝা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। সভ্যতার কষ্টিপাথর, কার্তিক ১৩২৬) প্রকাশের আগে পর্যন্ত বাঙলায় তিনি কিছু লেখেন নি।—প্রমথ চৌধুরী 'আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখো পবিত্র, এই যে আলীকে দেখছ, এঁকে ধরে-পাকড়ে বাঙলা লেখাতে পারো তুমি? ও ইংরিজি

ছাড়া লিখবে না, কিন্তু আমি জানি, ও যদি বাঙলা লেখে—কি অনবদ্য জিনিস বেরুবে কলম থেকে।' ("চলমান জীবন" ১, পৃ. ৯৫)। আলি সাহেব নিজেও জানিয়েছেন, 'বঙ্গভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিক, সবুজ-পত্রের সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের উপদেশেই আমি প্রথম বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করি। আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে তাঁর উপদেশ এবং উৎসাহ না পেলে হয়তো বাঙ্গালা সাহিত্যের জনতাবহুল আসরে কখনও নামতুম না।' ("দিবাচ্য", গুল-দাস্তা, ১৩৩৪)। কিন্তু ওয়াজেদ আলিকে ঠিক "সবুজপত্রে"র লেখক বলা যাবে কি না সন্দেহ, কারণ তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত মাসিকপত্র "গুলিস্তাঁ"র (১৯৩২) আদর্শ ছিল স্বতন্ত্র। "সবুজপত্রে"ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু 'হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত গুলিস্তাঁ' এই মিলন বলতে বুঝত অন্য কিছু। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শও হয়তো মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না আলি সাহেবের পক্ষে।

অন্যদিকে বিশের বা তিরিশের দশকে মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যেও এস. ওয়াজেদ আলি ছিলেন সব দিক থেকে বিরল ব্যক্তিক্রম। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মনে হয়েছে, 'মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহার মত এত অধিক পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি একরূপ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' ("মুসলিম বাংলা-সাহিত্য", ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৩২১)। আলি সাহেবের জন্ম হুগলি জেলার বড়-তাজপুর গ্রামে হলেও তাঁর বাল্য আর কৈশোর কেটেছে পিতার কর্মক্ষেত্র শিলঙে। সেখানে যে স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেন তার হেডমাস্টার ছিলেন ইংরেজ। শিক্ষার মাধ্যমও ছিল ইংরিজি। তারপর আলিগড় এম. এ. ও. কলেজে পড়তে গেছেন। সেখান থেকেই আই-এ. এবং বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। গ্রামের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি সত্য, কিন্তু অনতিপরে বিলাত গেছেন (১৯১২) কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। বি-এ (ক্যানটাব), বার-অ্যাট ল হয়ে ১৯১৫ সালে যখন তিনি কলিকাতায় ফিরলেন তখন সঙ্গে বিদেশিনী পত্নী। (নিতান্ত বালক বয়সে আড়াই-বছর-বয়সী আয়েশা খাতুনের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়, কিন্তু পরে বিলাত থেকে ফিরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।) শেখ ওয়াজেদ আলি এখন থেকে এস. ওয়াজেদ আলি নামে পরিচিত হয়েছেন। পিতা এবং ভাইদের মধ্যে অন্তত তিনজন 'শেখ' উপাধি কোনোদিন বর্জন না করলেও আলি সাহেবের পাশ্চাত্য ভাবানুসরণের নিদর্শন মিলবে এই ঘটনায়। বেশভূষায়, আহার্য-নির্বাচনে আর আচার-আচরণে বিদেশী রীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বাইরে থেকে তাঁকে কিছুটা 'ফিরিঙ্গি'-ভাবাপন্ন মনে হওয়াও অস্বাভাবিক ছিল না (যেমন মনে হয়েছিল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের)। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালি। ১৯২৮-২৯ সাল—এস. ওয়াজেদ আলি তখন কলিকাতায় অন্যতম প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট—ব্রিস্টলের মেয়ে মিসেস নেলি ওয়াজেদ আলি স্বামীকে ছেড়ে গেলেন স্বামীর ছোটোভাই শেখ শামসের আলির আকর্ষণে। সমাজ-ও পরিবার-জীবনে এক চরম নিঃসঙ্গ, প্রায় নিরাশ্রয় জীবন কাটাতে হয়েছে এস. ওয়াজেদ আলিকে। আর এই সময়েই বাঙলা সাহিত্যচর্চায় তাঁকে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি নিয়ে তিনি মেতে উঠেছেন, আসাম মুসলিম ছাত্রসমিতি ও নোয়াখালি মুসলিম ইনস্টিটিউটের সাংবৎসরিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন, "গুলিস্তাঁ" প্রকাশের উদ্যোগ নিচ্ছেন। এস. ওয়াজেদ আলির জীবনীকার জানান, 'এ-সময় কী-এক সূত্রে পরিচয় ঘটে শিক্ষিতা এক বার্মিজ কন্যার সঙ্গে। তিনি মিসেস বদরুন্নেসা আলি হয়ে, এস. ওয়াজেদ আলির অন্তর্মুখী নিঃসঙ্গ জীবনের শুশ্রূষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিজ হাতে।' (সৈয়দ আকরম হোসেন, 'এস. ওয়াজেদ আলি : প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী, জীবন-কথা', "এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী" ১, পৃ ৫৭৭)

এমন হতে পারে, আলি সাহেবের জীবনের এই সংকট-মুহূর্তেই তাঁর মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে যার ফলে নিজ নিকেতনে ফেরার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন।

১৯৩০ সালে নোয়াখালি মুসলিম ইনস্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে তিনি কিছুটা উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন—'ইসলামের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, আর ইসলামকে আমি মানবের সবচেয়ে কল্যাণকর এবং উপযোগী ধর্ম বলেই মনে করি। আমার স্থির বিশ্বাস ইসলাম নিজগুণে ধীরে-ধীরে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে; কোনো রাজশক্তি কিংবা organised mission-এর সাহায্যের তার দরকার হবে না। আমার আরও বিশ্বাস, নাগরিকতা বা স্বদেশপ্রীতির আদর্শের সঙ্গে ইসলামের যে একটা অনাবশ্যক সংঘর্ষ এখন চলেছে (আর সে সংঘর্ষ ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত) তার সন্তোষজনক সমাধান হয়ে গেলে (আর আজ না হয় কাল তা হবেই) ইসলাম আরও দ্রুতগতিতে মানবসমাজে ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে।' একে ঠিক ধর্মান্ধতা বলা যায় না, কিন্তু লক্ষ করব, আলি সাহেব ইসলাম-ধর্মাবলম্বী হিসাবে ক্রমেই যেন ইসলামধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠছেন।—'আমাদের প্রধান সাত্ত্বিক সম্পদ, ধর্ম। এই অমূল্য প্রতিষ্ঠান যে সমাজই আমাদের জন্য সম্ভবপর করেছে, তা যে কোনো ধর্মের পর্যালোচনা করলে অনায়াসে বুঝতে পারবেন। ইসলামের কথাই নিন। রোজা, নামাজ, হজ্জ, জাকাত প্রভৃতি সর্ববিধ অনুষ্ঠানের উচিত পালনের জন্য সমাজের প্রয়োজন। যে চরিত্রগঠন হচ্ছে ইসলামের প্রধান লক্ষ্য, তাও সমাজের বাইরে হতে পারে না।' ("তরুণের কাজ", ১৩৩৩)। 'আমরা মুসলমান; ইসলাম আমাদের ধর্ম। সমস্যার সমাধানে ইসলামের মূল সূত্রগুলির উপর আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।' ("মোসলেম নারী", ১৩৩৮)। 'ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলাম যে উদারতা দেখিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যায় না। আর সে উদারতা কোনো আকস্মিক ঘটনা বা chance incident নয়।···আমরা আশা করতে পারি এক বা একাধিক মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে ইসলামকে, মোসলেম কৃষ্টিকে যুগবাঞ্ছিত রূপ দান করবেন। ইসলাম তখন মুসলমানদের তথা বিশ্ববাসীদের নূতন প্রেরণা যোগাতে অগ্রসর হবে। সেদিন যে নিকটে তার আভাস আমরা পাচ্ছি। ইসলামের সেই নূতন রূপের জন্য, ইসলামের দ্বারা অনুপ্রাণিত সেই নূতন জীবনাদর্শের জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে আছি' ("মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ", ১৯৪৯)। "ইকবালের পায়গাম" গ্রন্থে আলি সাহেব শুধু 'বাংলাদেশে আল্লামা ইকবালের বাণী প্রচারের পহেলা কৈশেশ' করেন নি, গ্রন্থটি শেষ হয়েছে এই-ভাবে, 'রসুলিল্লাহ্ (দঃ) ইকবালের বিনীত আরজ শুনেছেন। যে ভূখণ্ডে ইকবালের দেহ সমাধিস্থ সে ভূখণ্ড এখন পাকিস্তান—ইকবালের স্বপ্নরাজ্য।' কিন্তু ইকবালকে 'মহাকবি' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সত্ত্বেও 'ইকবালের স্বপ্নরাজ্য' কখনই এস. ওয়াজেদ আলির 'স্বপ্নরাজ্য' ছিল না। তিনি মুসলমানসমাজের জাগরণ চেয়েছিলেন,—আর যাঁরা মুসলমানি পোশাক পরা পরিত্যাগ করেছেন, হিন্দু লেখকদের লেখা ইতিহাস উপন্যাস ইত্যাদি পড়ে যাঁদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে তাঁরা এদেশের নীচজাতীয় হিন্দু থেকে উৎপন্ন, এবং এই কুসংস্কারের দরুন যাঁদের মন আত্মঘৃণায় আত্মতাচ্ছিল্যে পূর্ণ, তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগানোর জন্য এমন সাহিত্য রচনা করেছেন যাতে মুসলমানদের সামনে তাঁদের ধর্ম এবং নিজস্ব সভ্যতার জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাঁদের গৌরবময় ইতিহাসের কাহিনী ও পূর্বপুরুষদের কীর্তি প্রচারিত হয় (এই দীর্ঘ বাক্যটি আলি সাহেবের প্রবন্ধেরই সারসংক্ষেপ)। বলা বাহুল্য, এই ধরনের মনোভাবের পিছনে কিছুটা প্রতিক্রিয়া কাজ করতে পারে, কিন্তু উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তিনি কখনও

অন্য সম্প্রদায়কে গালি দেন নি, বরং বরাবর বলেছেন —'মুসলমানকে হিন্দু কালচারের সম্মান করতে হবে, হিন্দুকে মোসলেম কালচারেরও সম্মান করতে হবে; আর এই দুই কালচারের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান এবং স্থায়ী জিনিস আছে তার কদর উভয়কেই করতে হবে। আর আস্তে আস্তে, মানুষের দৃষ্টি অতীত থেকে বর্তমানের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে, এবং অ-বর্তমানের বিষয় ভাববার যে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি আছে তাকে ভবিষ্যৎমুখী করতে হবে।...অতীতের মধ্যে যা কিছু হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতির পক্ষে সমান আনন্দদায়ক, সেই সব জিনিসেরই বেশি আলোচনা করতে হবে; আর, যা কিছু এই জাতির কোনো একটির পক্ষে পীড়াদায়ক, তাকে আমাদের ভুলতে হবে; অন্তত, তা নিয়ে আলোচনা যাতে কম হয়, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে' ("বাঙ্গালী মুসলমান", ১৯৩০)। আসলে স্বধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস নিয়েও অন্যধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ, আলি সাহেবের চিন্তাভাবনাকে সংকীর্ণতামুক্ত মানবতাবাদী পরিচয় দান করেছে।

এক সময় এস. ওয়াজেদ আলির "আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা" বইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিল। আকবরকে তিনি দেখেছিলেন 'একান্তভাবে যুক্তিপন্থী, সংস্কার-প্রিয়, নূতনত্বকামী এবং উন্নতিশীল নরপতি' হিসাবে। আকবরের 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র'-ধারণা তাঁর কাছে অত্যন্ত আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য আদর্শ মনে হয়েছে —'এই আদর্শেই ভারতের শাসনতন্ত্র সুচারুভাবে পরিচালনা সম্ভবপর—অন্য কোনো আদর্শে নয়।... ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ সম্মুখে রেখেই আমাদের জীবন-পথে অগ্রসর হতে হবে' ("সাহিত্য", ১৩৩৯)। 'ধর্ম-সমস্যার যে সমাধান আকবর করে গিয়েছেন ভারতবর্ষের লোক এখনও তা গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে আমার স্থির বিশ্বাস, এমন এক দিন আসবে যখন ভারতবাসীরা সে সমাধানকে সুষ্ঠুতম, শ্রেষ্ঠতম সমাধান বলে গ্রহণ করবে' ("আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা", ১৯৩৯)।

আকবরের ধর্মচিন্তা নিয়ে এখানে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আলি সাহেবের ধর্মচিন্তা তাঁর রাষ্ট্র- ও সমাজচিন্তার স্বরূপ উদঘাটনে সহায়তা করে, এমনকী তাঁর সাহিত্যচিন্তার পরিচয় গ্রহণেও তাৎপর্য বহন করে। ম্যাথু আর্নল্ডের উক্তি তাঁর রচনায় অভিনব সংযোজন ও তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়— 'Literature is the criticism of life from the viewpoint of the ideal immanent in life' ("সাহিত্য")। জীবনের এই অন্তর্নিহিত আদর্শের সন্ধানী এস. ওয়াজেদ আলি তাই জীবনের একটি পর্বে বাঙালিত্ব এবং বাঙালিকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে হয়, 'সাহিত্যিক জাতির রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং স্বার্থ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করতে পারে না। সেইজন্য সাহিত্যিক হিসাবে আমি এইটুকু বলতে চাই যে, স্বাধীন বঙ্গের আদর্শ সম্মুখে রেখেই ভবিষ্যতে আমাদের সাহিত্য-সাধনার পথে অগ্রসর হতে হবে।' ("সাহিত্য")। দেশবিভাগের অনতি-পূর্বে যখন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সমাজের সর্বস্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তখন আলি সাহেব শুধু তার বিরুদ্ধতা করেন তাই নয়, তিনি জাতি তথা রাষ্ট্রগঠনের এক স্বতন্ত্র আদর্শ প্রচার করেন। এই আদর্শ প্রচারের পিছনে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা-সমাধানের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই কাজ করেছে, তাঁর ভাষায়, 'একথা একান্ত-ভাবে সুনিশ্চিত যে, বাংলার সুদিন ততদিন আসবে না, যতদিন এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে ভালবাসতে না শিখবে, আর উভয় সম্প্রদায়ের লোক নিজেদের প্রথমত বাঙালি আর তারপর হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসাবে ভাবতে না শিখবে। এই মঙ্গলপ্রসূ মানসিকতার সৃষ্টি কি করে করা যেতে পারে, সেই হচ্ছে বাঙালির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা।' ("হিন্দু-

মুসলমান", ১৯৪০)। প্যান-ইসলামিজ্‌ম্ স্বভাবতই সমস্যা-সমাধানের পথ নয়। তিনি জানেন, 'এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাদের মন স্বভাবতই সংকীর্ণতার দিকে যায়, উদারতার দিকে যায় না।...এই শ্রেণীর লোক তাদের মনের ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থপরতাকে সাম্প্রদায়িক আকার দিয়ে দেশের ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে কলহ করে, আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ আর মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর লোকই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য দায়ী। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে, আর মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। উভয় স্বপ্নই যে আকাশ-কুসুমের মত অলীক সে কথা তারা বোঝে না, বুঝতে চায় না, এবং বোঝবার শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলেছে। অজ্ঞ জনসাধারণ তাদের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; আর তার ফলস্বরূপ দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর কলহ, মারামারি, কাটাকাটি, আর খুনোখুনি' (তদেব)। সাম্প্রদায়িকতা দূর হতে পারে জাতীয়তাবোধের প্রতিষ্ঠায়—হিন্দু বা মুসলমান জাতীয়তা নয়, বাঙালি জাতীয়তা, তথা প্রাদেশিক জাতীয়তা। কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবন মধ্য-যুগের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অতীতমুখী হওয়ার ফলে (আলি সাহেব একে বলেছেন এক-ধরনের 'শ্মশান-মানসিকতা') আমাদের পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রাদেশিক জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। আসলে যাবতীয় বিরোধের পিছনে কাজ করছে ধর্ম বা ধার্মিকতার ভ্রান্ত ধারণা। এস. ওয়াজেদ আলি তাই বলবেন, 'আমি পরলোকের চিন্তা বর্জন করতে বলছি না, ধর্মকেও বিসর্জন দিতে বলছি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি পরলোক এবং ধর্মে একান্তভাবে বিশ্বাস করে থাকি, তবে পরলোকের নামে এবং ধর্মের নামে যে শ্মশান-মানসিকতা চলে আসছে তাকেই আমি বর্জন করতে বলছি। বিকার-গ্রস্ত শ্মশান-মানসিকতাকে যদি বর্জন করতে পারি, এই বস্তুতন্ত্র পৃথিবীর ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে যদি সমপ্রজ্ঞায় নিয়ে বরণ করতে পারি, এবং আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীরা, রাষ্ট্র ও সমাজ-নেতারা যদি সেই পরিশুদ্ধ মানসিকতার ভিত্তিতে জীবনসাধনায় অগ্রসর হন, তাহলে জাতীয়তার আদর্শ এদেশে সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলন আপনা থেকেই হয়ে যাবে।' ("হিন্দু-মুসলমানের মিলন", ১৯৪০)।

স্ব-তন্ত্র বঙ্গের কল্পনা

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের এই আদর্শ আপাত-দৃষ্টিতে কবির কল্পনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আলি সাহেব এই আদর্শের উপর ভিত্তি করেই 'ভবিষ্যতের বাঙালি'র জন্য 'স্বাধীন বঙ্গে'র পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন। মনে রাখতে হবে, এই পরিকল্পনা ১৯৪৭ সালে বাস্তবায়িত হয় নি সত্য, কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা অনেকে বাঙালিদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তুলেছেন। এবং বিস্ময়কর হলেও সত্য, দেশবিভাগের আগে আলি সাহেবের বক্তব্যের সঙ্গে মতৈক্য ঘটে বেশ কিছু হিন্দু রাজ-নীতিবিদের। 'ধর্মরাষ্ট্রে'র পরিবর্তে 'জাতীয়তার ভিত্তির উপরেই রাষ্ট্রীয় জীবন' গড়তে চাওয়ার মধ্যে যে-মুক্ত-বুদ্ধির (আলি সাহেবের ভাষায় 'শুভবুদ্ধি ও জ্ঞানের উদ্বোধন এবং সম্প্রসারণ') পরিচয় মেলে, সে-কালে প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তার অভাব দেখা গেছে, আর পরিণামে বঙ্গবিচ্ছেদ ও অনন্তিপরে বাঙালিত্ব রক্ষার জন্য বাঙালির প্রাণক্ষয়ী সংগ্রাম।

১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে এস. ওয়াজেদ আলি সম্ভবত প্রথম স্বাধীন বঙ্গের পরিকল্পনা উপস্থিত করেন, পরে বিভিন্ন প্রবন্ধে, বিশেষত 'ভবিষ্যতের বাঙালী' গ্রন্থে তিনি তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর পরি-কল্পনা সংক্ষেপে এইরকম—

১. আমরা ভারতবর্ষ থেকে, কিংবা কোনো-না-কোনো ভারতীয় জাতি-সঙ্ঘ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হতে পারি না, তবে সেই সঙ্ঘের মধ্যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারি। আমাদের লক্ষ্য হবে—ভারতীয় জাতীয়তা নয়, পক্ষান্তরে সমান-অধিকার-সম্পন্ন রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মধ্যে বাঙালির স্বতন্ত্র জাতীয়তা; যেমন সমান-অধিকারসম্পন্ন ব্রিটিশ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মধ্যে আছে কেনেডার, অস্ট্রেলিয়ার এবং আয়ারল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র জাতীয়তা।

২. এখন যাঁরা অখণ্ড ভারতীয়তার আদর্শ প্রচার করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো-না-কোনো উপায়ে ভারতবর্ষে হিন্দুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। এ আদর্শের আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমরা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তাতে বাঙলার হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সব জাতিরই মঙ্গল হবে, আর অখণ্ড ভারতীয়তার আদর্শ থেকে বাঙলার—তথা বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের মঙ্গল হবে না।

৩. চিন্তার, কল্পনার, সেবার এবং সাধনার যে বিরাট এক জগৎ এখন আমাদের কাছে বন্ধ আছে, বাঙালিত্বের মনোমুগ্ধকর আদর্শের জাদুস্পর্শে তার দুয়ার খুলে যাবে। আমরা তখন বাঙালিদের সৈনিক করবার চেষ্টা করব, বৈমানিক করবার চেষ্টা করব, আত্মরক্ষায় সমর্থ যুদ্ধ-কুশল জাতিতে পরিণত করবার চেষ্টা করব। বাঙলার স্বতন্ত্র অর্থনীতির, বাঙলার স্বতন্ত্র সমাজনীতির, বাঙলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রনীতির সৃষ্টি করবার চেষ্টা করব। বাঙালিত্বকে এবং বাঙালিকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করব।

৪. ভারতীয়দের পক্ষে—তথা বাঙালিদের পক্ষে, ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই একমাত্র সম্ভবপর এবং বাঞ্ছনীয় আদর্শ। চারশত বৎসর পূর্বে মহানুভব সম্রাট আকবর এই সত্যটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এই আদর্শেই ভারতের শাসন-তন্ত্র সুচারুভাবে পরিচালনা সম্ভবপর—অন্য কোনো আদর্শে নয়। এখানে বিভিন্ন-ধর্মাবলম্বী লোকেরা বাস করে। সুতরাং কোনো বিশেষ এক সম্প্রদায়ের ধর্মকে রাজকীয় ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে না। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ সম্মুখে রেখেই আমাদের জীবন-পথে অগ্রসর হতে হবে। (সাহিত্য, ১৯৩৯)।

এস. ওয়াজেদ আলির রাষ্ট্রচিন্তায় একই সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ও সমন্বয়স্থাপনের যে 'মনোমুগ্ধকর আদর্শে'র প্রকাশ, তা আমাদের আকর্ষণ করে। কিন্তু তাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় নি। মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মতো অনেকেরই মনে হয়েছে, 'ওয়াজেদ আলির সাহিত্যিক জীবনে একটা নিবিড় নিঃসঙ্গতা ছিল ; সমাজের সঙ্গে কোনো যোগই তাঁর ছিল না, সেজন্যেই তাঁর সাহিত্যে তাঁকে দেখি আমাদের পরিচিত বাস্তবজীবন-নিরপেক্ষ সৌন্দর্যের ধ্যান করতে'। (মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্সান, "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আধুনিক যুগ", ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ ২১৬)। অথচ আলি সাহেবকে বাস্তববিমুখ সৌন্দর্যমুগ্ধ স্বপ্নচারী কবি অভিহিত করে, তাঁর রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। আসলে বাস্তব আর কল্পনাকে মেলাবার সাধনাই তাঁর সাধনা। হয়তো মেলাতে পারেন নি, আর সেজন্য দেশ-কাল-পাত্রই অনেক পরিমাণে দায়ী। একই সঙ্গে বিদেশী শাসনের দায়ভাগ এবং স্বদেশী ভাবপ্রবণতার 'tradition'—তাঁকে বহন করতে হয়েছে। ধর্মের বিকৃতি তথা ধর্মাচার (তাঁর ভাষায় 'আনুষ্ঠানিক ধর্ম' এবং ধর্মের 'আপেক্ষিক সত্য') তাঁর আপত্তিকর মনে হলেও, ধর্মকে বাদ দিয়ে তাঁর পক্ষে কোনো আদর্শের কল্পনা সম্ভব ছিল না। ঔরঙ্গজেবের ধর্মনিষ্ঠা মোগল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারে নি, তাঁর নিজের জীবনও 'ব্যর্থতার বিরাট এক দৃষ্টান্ত।' কিন্তু তা সত্ত্বেও আলি সাহেবের ধারণা, ঔরঙ্গজেবের 'ব্যর্থতার মধ্যেও তাঁর বিরাটত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গৌরব এইখানে যে, স্বার্থের খাতিরে তিনি নিজের আত্মাকে কখনও প্রতারিত করেন নি ; স্বার্থের খাতিরে তিনি কখনও ধর্মের পতাকা ছেড়ে যান নি। ভারতের এই মহাকায় puritan (ত্যাগী পুরুষ) সেই বিরল উপাদানে গঠিত হয়েছিলেন, যে উপাদানে গঠিত হন সেই সব মহামানবেরা—যাঁরা এই পৃথিবীতে শহীদের (martyr) রক্তমণ্ডিত মুকুট অর্জন করেন' ("আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা")। কিন্তু ধর্মের পতাকাবাহী ঔরঙ্গজেব কোন্ ধর্মের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন ? আর, আকবর, যিনি উদার সর্বজনীন ধর্মনীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতীয়তার আদর্শ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন কেন ? এস. ওয়াজেদ আলি আকবরের ধর্ম ও কর্মকৃতির একান্ত অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে, 'আকবরের মৃত্যুর পর দীনে এলাহির নাম ভারতবর্ষে আর শুনা যায় নাই।…তিনি সত্যই যে জিনিসকে সব ধর্মের সার বলে মনে করেছিলেন, তারই উপরে তাঁর দীনে এলাহি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই সর্বজনীন দীন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর একদিনও টিকলো না ; কারণ লোক তাঁর পয়গম্বরত্বে বিশ্বাস করতে পারলে না। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ধর্মের [তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষতার] এই প্রথম experiment ব্যর্থ হল।' ("মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার পথ")। এ থেকেই আলি সাহেব সিদ্ধান্ত করেন, 'মানুষের কিন্তু বড় একটা দোষ, বুদ্ধির চেয়ে সংস্কারের কথাই সে বেশি শুনে। যুক্তির পথ ছেড়ে, সংস্কারের পথেই সে চলে।' এখানে এস. ওয়াজেদ আলি শুধু বাস্তববাদী নন, প্রয়োগবাদীও (pragmatic) বটে। তিনি নজরুল ইসলামের কবিতায় হিন্দু-মুসলমান ঐতিহ্য-সমন্বয়ের প্রয়াসে ক্ষুব্ধ। তিনি মুসলমান সাহিত্যিকদের বলবেন—'আমি ইসলামিক কালচারের ভিত্তির উপর আপনাদের সাহিত্য গড়তে বলছি, তার কারণ, ইসলামকে আমি আল্লার শ্রেষ্ঠদান বলে মনে করি, আর আমার স্থির বিশ্বাস, যে কালচার ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, সেই কালচার জগতের শ্রেষ্ঠ কালচার বলে গণ্য হবে, আর বিশ্বমানব আস্তে-আস্তে তাকেই জগতের আদর্শ কালচার বলে বরণ করবে। ইসলামকে কেন উচ্চে স্থান দিই, "ইসলামের দান" প্রবন্ধে তা আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি।' (তদেব)। "ইসলামের দান" (১৯৩০) প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হল—'ধর্মকে সে [মানুষ] যদি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে পেতে চায়, তাহলে ইসলাম ছাড়া তার অন্য পথ নাই। এইজন্যই কোরান শরিফে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন,…আজ তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলুম। আমার দান আজ শেষ হল। ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে নির্দিষ্ট করলুম।' অথচ তারপরেও মোগল বাদশাহকে দীনে এলাহি প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে !

একে যদি তাঁর মানস-জীবনের এক ধরনের স্ববিরোধ, বা তাঁর চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা বলি, তাহলেও এস. ওয়াজেদ আলির মনীষা এবং সাহিত্য-কৃতির মূল্য হ্রাস পায় না। তাঁর প্রবন্ধ যখন পাঠকের মনে প্রতিবাদস্পৃহা জাগায়, তখনও তাঁর মতামতের প্রতি কেউ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারেন না। সংস্কার ও স্বাধীন চিন্তার দ্বন্দ্বে আমরাও নিত্য ক্ষতবিক্ষত, আমাদের চিন্তাভাবনাও অনেক সময় তিক্তদ্বিধায় সীমাবদ্ধ। আর সেইজন্যই হয়তো আলি সাহেবের সঙ্গে একধরনের একাত্মতা অনুভব করি ; মনে হয় তিনি যুগান্তর-সৃষ্টিক্ষম লেখক না হলেও যুগের প্রাণস্পন্দনটুকু তাঁর লেখায় সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরেও তাঁর রচনা প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি, এ বড়ো কম কথা নয়।

ঘুঘু ডাকে

সাধন চট্টোপাধ্যায়

ঘুঘু ডাকে। কী বলে? সতী-ঝিলো পু—র। পু—র। তুমি শোন ঘুঘুরু! ঘু- ঘু। যতদিন আকাশে চন্দ্র-সূর্য থাকবে, ডাইনি সতিন শাপভ্রষ্ট ঘুঘু হয়ে নির্জনে বিলাপ করবে সতী-ঝিলো!···তুমি শুনবে ঘু—ঘু। ঘরের বউ ডানা গজিয়ে সেই যে জানলা গলে উড়াল দিয়েছিল ঘুঘু হয়ে, আজও মুক্তি নেই। কেঁদে-কেঁদে বেড়ায়; তুমি বল ঘুঘু ডাকে।

ছ বছরের পারুল গল্পটা থামিয়ে দিদিমাকে ভেজাগলায় জিগ্যেস করে—সতিন কি দিমা?

না, না, পারুলের কাছে কেউ বসে নেই। এমনিতেই দেহের রঙ বেজায় কালো, আটচল্লিশে ছমড়ে-মুচড়ে চামড়ায় এমনই রুক্ষতা, যেন এসব রুঠো দেহভঙ্গিতে বাল্যকাল থাকতে পারে না—দিদিমার কোল লেপটে গল্প শোনা দূরের কথা। এখন ঝুকঝুকে ভোরে সবে ঝাঁপের হুড়কো খুলে উঠোনে দাঁড়িয়েছে পারুল। খুব আকাশে ছোট্ট নমস্কারের জন্য। হেমন্তকাল। অমলিন কোমল আকাশ আলোর আভাসে সামান্য প্রতিভ মাত্র। শেষ রাতের তন্দ্রায় পারুল দেখেছিল দিদিমার হাসি-হাসি মুখখানা কুয়াশায় ডুবছে ক্রমশ। চটকা ভাঙতেই, ধড়মড়িয়ে পাশের বিছানায় উঁকি দিয়েই বাইরে দাঁড়াল। চোখজোড়া ঘোলাটে লাল—অনিদ্রার চাপে জ্বলছে। মধ্য ঘরে তরল অন্ধকার; হারিকেনটা ক্লান্ত রাত পেরিয়ে অ নির্বাণ ভুষোকালি মেখে; নীল নাইলন মশারির এলানো চালের নীচে বুড়ো শ্রীপতি পাকড়াশি। পুরো দেহটাই ময়লা লেপে ঢাকা, মাথার অংশে কাঁচা-পাকা কিছু চুল শুধু সারারাত টিনের চালের হিম খেয়ে বাসি। আজ শ্রীপতি মরবে। পনেরো বছর ব্যাধির আক্রমণে বহুবার ঘোষিত মৃত্যুর দিন কাটিয়ে উঠলেও, আজ অন্তিমযাত্রার দিনক্ষণ গতরাতে ভৌতিক ছায়ারূপে নির্ভুল দেখতে পেয়েছে সে। তাই পারুলের চটকা ভাঙিয়ে কাতর ভঙ্গিতে শেষ বাসনাটুকু জানিয়েছিল। সরু ভাত আর দেশি কাঁকড়ার ঝোল।

উঠোনে গোবরছড়া দিতে গিয়ে পারুল থমকে রইল কিছুক্ষণ। অমঙ্গল। মৃতদেহ কাঁধে চড়লে ছড়া দেয়া হয়। হাঁড়িটা রেখে দিল ভয়ে। পাশের খোপে বাইশ বছরের ঝুন্টু ঘুমোচ্ছে। বড়ো ছেলে। কাল সারারাত জেগে কাটালেও একবার ফিরে তাকায় নি। দশটায় ক্যারাম খেলে ফিরেছিল ক্লাব থেকে, ছোটো দুটি বোনের ওপর চোটপাট এবং হাঁড়ির সব ভাত গিলে খোপটুকুতে নাক ডাকতে শুরু করেছিল; এমনকী নতুন চালের ফ্যানটুকু—যা পারুল সরিয়ে রেখে শরীর খারাপের ছুতোয় পেট ভরায়—ঝুন্টু শুষে নিয়েছে। তবুও পারুল মেজাজ হারায় নি। ছেলেকে ভয় পায় সে, গর্জন আর নিষ্ঠুরতায় অসহায় হয়ে পড়ে।

উষালগ্নে কাঁকড়ার ব্যাপারটা জানিয়ে ঘুম ভাঙাতে গিয়েও সিদ্ধান্ত পালটে নিল। ঝুন্টুর মর্জি বোঝা ভার। হয়তো সাতসকালেই কাণ্ড বাধিয়ে বসবে কিছু। বাসনমাজা, ঝাঁট দেয়া এবং প্রাতঃকৃত্যাদির মধ্যেই হেমন্তের সকাল বেলুন হয়ে ভাসছে। ভোরের হিম আর কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেছে দিদিমার মুখ। সতিনের ঝি একরত্তি মেয়ে সংসারে খেটে যায় মুখ বুজে। গায়ে ছেঁড়া ত্যানা, পেটে নেই ভাত। ডাইনি সৎমা পায়ের ওপর পা তুলে হুকুম দিয়েই খালাস। চোখের জলে মেয়ের বুক ভাসলেও সান্ত্বনার কেউ নেই। বাসন মাজে, কাঠ কাটে, ধান ঝাড়ে, ঘর লেপে; বেলা ঢলে পড়লে ক্লান্ত মেয়ে ভাঙা সানকিতে দুটো ভাত আর একটু শাক পায়। ডালিমগাছে তখন একটা টুনটুনি দোল খেতে-খেতে বলে: কেঁদো না মেয়ে! তোমার চোখের জল একদিন সোনা হবে, রুপো হবে।

ঘরে ঢোকার মুখেই ভাঙা চালের মটকায় একটা কাকের অলুক্ষনে কা-স্, কা-স্, ডাক। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। পারুল একটা ঢ্যালা ছুঁড়ে ঝা! ঝা! চেঁচিয়ে, আপোদ আর ডাকবার জায়গা পেল না!—ভাবে। কাকচরিত্র নাকি অব্যর্থ! ওরা গেরস্থর অমঙ্গল আগাম টের পায়।

লেপ মুড়িয়ে শ্রীপতি ইতিমধ্যে বিছানায় উঠে বসেছে। প্রস্রাব করবে বউকে ডাকে হাতের ইশারায়। বাইরে আনল পারুল দুই ডানা ধরে। শ্রীপতির নাকের ডগাটা অদ্ভুত হলুদ, ঠোঁটজোড়া শুকনো, গর্তচোখের চারদিকের কালচে ছোপগুলো উঠোনের আলোছায়ায় পারুল দেখল একটু স্বাভাবিক। ভরসার কথা। কিন্তু মুঠোয় ধরা হালকা দেহটার ক্রমাগত ঝাঁকুনিতে বোঝে এ যাত্রা টিকল না বোধ হয়। ফের বিছানায় এসে কথা বলতে শ্রীপতি পাঁচ মিনিট খাবি খেল চোখ বুজে।

—ব্যথা হচ্ছে?

—কম।

খিদে পাচ্ছে? ঘাড় নেড়ে প্রশ্নের সায় দেয়। ইশারায় চায়ের কাপ মুখে তোলে।

চায়ের মধ্যে তিনচামচ অতিরিক্ত দুধ ও দুখানা ব্রিটানিয়া বিস্কুট এগিয়ে দিল পারুল। পথ্য। তিন চামচে অন্তত একফোঁটা রক্ত হবে। পড়শিরা বলে পাকড়াশিকে ভালোমন্দ একটু খাইও, বউ। তাই আধপো রোজের দুধ। তাতেও রেহাই নেই। ঝুন্টু মাঝে-মাঝে একঘেয়ে ফ্যান-ভাতের জন্য ঘুরিয়ে পারুলকে শোনায়—কি নেই ঘরে? দুধ! বিস্কুট! সব কি আর রুগি পায়? জানি না! দাঁড়া, সময় আসুক! পারুল নিরুত্তর।

সকাল আরও সরোগরো হলে, দু মেয়ে—অনু আর মনু পাড়ায় নামে। এটা অভ্যেস। পারুল বকেঝকেও স্বভাব ফেরাতে পারে নি। আর ঝুন্টু মুখ ধুয়ে, প্যানট গলিয়ে এতক্ষণে চলে গেছে নিতাইয়ের গ্রিল কারখানায়। চা-বিস্কুট ওখানেই পায়। আজ অবশ্য অনু-মনুর জন্যই পারুলের মাথায় আগুন। সারা রাত যমে-মানুষে টানাটানি যেখানে, আজ ঘরে থাকার দরকার ছিল না? কখন কী প্রয়োজন। উঠোনে দাঁড়িয়ে পারুল গলা ফাটাবে? কোথায় কাঁকড়া, কোথায় আদা-পেঁয়াজ, একশ গ্রাম

তেল—পারুল তার হাত কেটে তৈরি করবে? হঠাৎ পাড়া ঘুরে একআঁটি কচি লাউশাক নিয়ে ঢুকতে, পারুল মনুকে বলে—ঘরে থাকিস। আসছি। রাস্তায় উঠে মাথায় আঁচলটা সামান্য তুলে নিল।

অমূল্য বিশ্বাসের মেয়ে আরতি ফিরছে বাসরাস্তা থেকে। কাঁধে চামড়ার কালো ব্যাগ, শাড়িখানা তাকলাগানো। ও একটা নার্সিং হোমের আয়া। বিভিন্ন শিফটের ডিউটি।

—এত বেলা হল? পারুল জিজ্ঞেস করল।

—সকালে বাস ছিল না। চললে কোথায়?

· দোকানে। শাড়িটা বুঝি নতুন?

—দেখ নি আগে? পরেছি তো।

পারুল আড়চোখে দেখে নিল আরতির সাজ-সজ্জায় কী নতুনত্ব আছে যা বিকেলের বউ-মজলিশে জমবে ভালো। পরচর্চার উপকরণ বড্ড একঘেয়ে হয়ে পড়েছে ইদানীং।

'গোরি তেরা গাঁও মেরা···' ব্যাটারিমাইকের ঝঙ্কার-চমকে রিকশাটা পাড়ার ঢালু রাস্তায় ঢুকল —লাল, নীল লিফলেট ছড়িয়ে। দি গ্রেট ফেমাস সার্কাস! কাঠের ব্লকে বাঘ, বাঁদর, ভালুকের সস্তা ছবি। এই আম, বট, কুল আর মান্দারের পাতার স্তূপে ঢাকা, জলাভূমিতে গড়া কলোনিটার নিস্তরঙ্গ দিনরাত্রির মধ্যে হঠাৎ দমকা-সুরে পারুলের বুকে একঝলক খুশির বাতাস। আজ পনেরো বছর সে থিয়েটার, বায়স্কোপ, যাত্রা দেখে না। আঠারো বছর বিয়ে হয়েছে; ওই একই ঝুপসি ভাঙা ঘর, রুগ্ন শ্রীপতি, অনু-মনু আর ঝুন্টুকে নিয়ে বাদলার কাদা-জল, শীতের নীচু ধোঁয়াশা আর জ্যৈষ্ঠের নিদারুণ দাবদাহে প্রতিটি রাত্রি-দিন অতিক্রান্ত। এই তো লাগোয়া শহরাঞ্চল পার্থপুরে যাত্রা হয় প্রতিবার, মাঠের মধ্যে বায়স্কোপ দেখায় শীতকালে, এক মাইল দূরে সিনেমা হল হয়েছে—পারুল যায় নি। প্রথম-প্রথম দীর্ঘশ্বাস উঠত, এখন উলটো। কোথাও দু-ঘণ্টার জন্য বাইরে বেরোলে, এই ঘর, অসুস্থ মানুষটা, বেয়াড়া ঝুন্টু কিংবা কাঁথাকানির সংসারটার জন্য মন কেমন করে। ঘাড় ধরে টেনে আনে কে যেন।

দোকানে গগন বিশ্বাস হাতায় ডাল মাপতে-মাপতে অবহেলা করল। অনিচ্ছুক মেজাজে বিশ মিনিট দাঁড় করিয়ে শেষে আদা-পেঁয়াজ এবং পঞ্চাশ গ্রাম তেল দিল ধারে। পারুল চেয়েছিল একশ। পথের পাশেই নিতাই সরকারের উঠোনে ঝুন্টু বিড়ি মুখে লোহায় শিরিষকাগজ ঘষছে, রেড-অকসাইড লাগাবে। উঠোন আর টিনের শেডটাই হল ফ্যাকটরি। নিতাই প্রথম জীবনে মাছ ফেরি করত, এখন দোর-গোড়ায় নতুন একখানা বাজাজ স্কুটার। ধোপছুরস্ত ধুতি-পানজাবিতে যখন ছ চাকায় হুশ-হাশ উড়ে যায়, বুকপকেটের লাল-সাদা দামি সিগারেট প্যাকেট মিহি আড়ালেও স্পষ্ট। যখন যে দল ক্ষমতায়, নিতাই চলতি হাওয়ার পন্থী। সমাজের দুর্বল শ্রেণী সম্পর্কে সরকারি আইনকানুনের জটিল সব সুলুক-সন্ধান জানে সে। তবে নিতাইয়ের কৃতজ্ঞতাবোধ শূন্য নয়। পাকড়াশিদার প্রতি পুরোনো দায় ছিল বলেই ঝুন্টুকে নিজের কারখানায় চাকরি দেয়। ঝুন্টুকে দেখে পারুল হাতের ঠোঙা আঁচলে লুকিয়ে, বাড়তি ঘোমটার আড়ালে সুরুত করে রাস্তাটুকু পার হয়ে গেল।

নির্জন ঘরে বিছানায় শ্রীপতি হাতের ডানা উলটে-পালটে পরখ করছিল, কিছু উন্নতি হয়েছে কিনা। গতরাতে মৃত্যুর দিনক্ষণ ঘোষণার পরও, বাইরের জীবন্ত পৃথিবীর ছোঁয়ায় এখন ভাবছিল উঠে দাঁড়াবে, হাঁটবে, পাড়ার বাদ-বিসম্বাদে বিচার করবে এবং অনু-মনুর বিয়ে দেবে এমন ঘরে—পড়শিদের তাক লেগে যায়। ভাগ্যে কার কী আছে বলতে পারে কেউ! তাছাড়া মেয়ে দুটো দেখতে খারাপ না। এসব ক্ষণিক ভাবনার কথা কাউকে সে বলে না, পারুল বা ছেলেমেয়েদের সামনেও ব্যাপারটা এমন সহজ ভঙ্গিতে রহস্যময় রাখে যেন পাকড়াশির কোনো গোপন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউনটে লাখ খানেক টাকা জমানো। পারুলের ওপর ঝুন্টু খুব হম্বিতম্বি যখন করে, মা ভৈ মুদ্রায়

দুর্বল হাতটা তুলে শ্রীপতি ছেলেকে বলে—এ দুঃখ থাকবে না। অমন গ্রিলের মালিক তুইও হবি। তবে···

—তবে?

—তোর দৌড়টা দেখি আগে।

—তুমি টাকা দেবে?

—উহুঁ! আগে পাশ-বই দেখা কত জমাতে পারিস। তবে। যত তুই জমাবি, তত আমি দেব। দশ-বিশ-ত্রিশ যত তুই দেখাতে পারবি, আমি তত দেব।

মাঝে-মাঝে পারুলের মনে ধন্দের সৃষ্টি হয়। আঠারো বছর বিবাহিত জীবনে নিরবচ্ছিন্ন ধনের মধ্যে পুঁজির কোনো লক্ষণ সে তো দেখে নি? অভিমানে ভাবল, সে তো কিছু আশা করে এ বাড়ি আসে নি। তবে কেন স্বামীর এই গোপনীয়তা!

—খিদে পাচ্ছে? আজ কাঁকড়ার ঝোল খাওয়াব। তুমি তো বল, দিদির মতো রাঁধতে জানি না। আজ দেখবে!

দিদি মানে ঝুন্টু, অনু, মনুর মা।

রসিক শ্রীপতি ম্লান হাসিতে বলে—কই গেছিলা? খুশি-খুশি লাগে?

—রামো! মুখ খসবে তোমার। বালাই ষাট। পারুলের চোখে যৌবনরস মুহূর্তের জন্য দীপ্তি ছড়ায়। হঠাৎ মানুষটা নিঃশব্দ যন্ত্রণায় অসহায়। বালিশে মাথা দিয়েই হাওয়া ছাড়ল মুখে। বসে কষ্ট হচ্ছিল এতক্ষণ।

—ডাক্তার?

না—শ্রীপতির ইশারা।

—শুয়ে ভালো লাগছে?

ছোট্ট হুঁ! বলতেই পারুলের চোখ ছলছল।

কাঁকড়ার জন্য সে এখন ব্যস্ত। নীরবে আমকাঠের ছোট্ট আলমারিটা খুলে পেছন ফিরল, অনু-মনু আছে কিনা। ভেঙেপড়া ঝুপসি চালাখানায়, আবৃত আসবাব-পত্র বলতে সাকুল্যে ট্যারা-ব্যাঁকা আলমারিটা। সামান্য টিপ-তালা লাগানো। ভেতরে পদ্মফুল আঁকা একটি টিনের তোরঙ্গ—ন্যাপথালিনযুক্ত দুখানা তোলা শাড়ি আর শ্রীপতির যৌবনকালের একখানা হলুদ ছোপের ফটো আছে যার মধ্যে—দুখানা পেতলের বাসন, একটি ঘটি, কিছু বাহারি কাঁচের শিশি-গ্লাস, বুটিদার একজোড়া সোনার দুল, পারুলের বিয়ের, শ্রীপতির একখানা এল-আইসির পলিসি-কাগজ—তিন কিস্তির পর যেটা বন্ধ হয়ে গেছে। পারুল পাল্লা খুলে চার টাকা সত্তর পয়সা রেখে দিল। গতকাল দশ টাকা ধার করেছিল পাড়া থেকে, শ্রীপতির কয়েকটা ট্যাব-লেট কেনার জন্য, বাকিটা এখন লুকোনো থাক। এই আলমারিটা ঘিরে বাড়ির সকলেরই সন্দেহ আর রহস্যময়তা। ঝুন্টু ভাবে বাবার অনেক কিছু মণি-মাণিক্য ফাঁকি দিয়ে পারুল ওখানে জড়ো করে রেখেছে। চাবি নিয়ে পারুলের অহেতুক সাবধানী দৃষ্টিতে সন্দেহের বাতাবরণ ঘনীভূত।

রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে মাঠ-বিল। হেমন্তে ছড়ানো-ছিটোনো জমা জল। একটি বিচ্ছিন্ন জল-কণির পাশে পারুল স্নেহদৃষ্টিতে থমকে দাঁড়াল। কাদামাটির পার ঘেঁষে অসংখ্য জলবোঝাই গর্তের মধ্যে কৌশলে একটা কাঠি গুঁজে দিয়ে তবেই কনুইটা নিঃশব্দে ঢুকিয়ে দেয়। কাঁকড়া ধরা পড়ে। পারুল এখন শিকারি। একদা বিলরূপী বিস্তীর্ণ মাঠের গর্ভে জলে টান ধরলেও মাটি কাদিয়ে আছে। কনুই পর্যন্ত নেমে গেলে আঙুল-গুলো অজানা পাতালে কিছু খোঁজে। উত্তেজনায় একাগ্র। ভয়-ভীত নেই। অজানা বিবরে বিল কেউটে যে ছোবল দিতে পারে—মনে হয়েছিল বাড়ি ফিরে। একটু শক্তি দিয়ে মুঠির কাঁকড়াটার সন্ধিপদ ভাঙে—কুট কুটস। ঝুড়িতে অসহায় খচমচ শব্দ। শক্ত দেহ-খোলের প্রান্তে প্রাণীটার একজোড়া চোখ—দুটি ঘন কালো জলজ পুঁতি—মরণযন্ত্রণায় হিংস্রতা হারিয়ে ম্লান হয় ক্রমশ। পারুলের মণিবন্ধে কাদা-জল শুকোয়, এমনকী সাদা শাঁখাটা মাটি মেখে কদাকার। কেবল চারপাশের কুলেখাড়ার কাঁটায় পা পড়লে মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট উঃ! এইসব জঙ্গলে কাঁটার বড্ড জ্বালা।

শিকার শুরুর আগে কিছু সময় চুপচাপ বসেছিল যখন, বিলের রু-রু হাওয়ায় বহুদূরের লাউলের শব্দ অস্পষ্ট হচ্ছিল পারুলের তন্ময়তায়। খুব কাছেই একটি অসতর্ক মাছরাঙার উদাস রূপ আর বিলময় নিবিড় আকাশ। থই-থই রোদ। হিম নেই, কুয়াশা ভেঙে গেছে দিদিমার মুখও। টুনটুনি পাখি বেগুনখেতের ছোট্ট বাসায় ঠ্যাং তুলে শুয়ে থাকে, আকাশটা ভেঙে পড়লে ঠেকাবে। রাবণ সিঁড়ি বানালে মানুষ যেতে পারত। ওখানে পারুলের বাবা-মা আছে। দিদিমাও চলে যাবে সুরুত করে একদিন। এখন হাসি পেল ছেলেমানুষি কথাগুলো ভেবে। তবে পরের জন্মে পারুলের পাখি হবার প্রবল ইচ্ছা। আকাশে উড়তে-উড়তে দেখবে দেবদেবীরা কোথায়। আজন্ম পারুলের চিন্তায় আকাশ রহস্যময় শূন্যস্থান। তাই তো মুখ তুলে নিঃশব্দে কাঁদলে বুকটা হালকা হয়।

হঠাৎ কে যেন খুকখুক কাশি দিল। অবিকল শ্রীপতির গলা। পেছন তাকিয়ে কিছু নেই। শুধু আকাশ আর শোলার ঝোপে সেই মগ্ন মাছরাঙাটা। তখনই অশুভ চিন্তায় বুকটা গুড়-গুড় করতে, আধঝুড়ি কাঁকড়া নিয়ে ছুট। চুপচাপ চোখের কোনা মোছে। পড়শিরা বলবে কী? মুমূর্ষু স্বামীকে ফেলে কেউ যায়? মাগীর শখ দেখো! মাঠের পথে বার-বার হোঁচোট খেতে হয়।

নিতাইয়ের পাকাদালানে বারোটার টি-ভি-তে 'স্ট্রাইহক' দেখছিল ঝুন্টু। পাশে একগাদা ছেলে-ছোকড়া। ঝুন্টুর এ বাড়িতে পজিশন আছে বলে বিড়ি ধরায় লাল আঙুলে—রেড অকসাইড শুকিয়ে কড়কড়া। এ উত্তেজক আধঘণ্টায় ঝুন্টুকে টিভি থেকে সরাতে পারে না কেউ। মালিকও না। নিতাই কাজ আদায়ের কৌশল জানে। অর্ডারের চাপে সারারাত কাজ থাকলে মিস্ত্রির হাতে সস্তা দরের বোতলের পয়সা গুঁজে দিয়ে, নিজে ঘুমোয়। সামনে থাকে না। জীবনে প্রথম মদ গিলে ঝুন্টুর খুব পাপ-বোধ জন্মেছিল। ক্রমে অভ্যস্ত। এখন নাড়ী-ভুরি জ্বলছে খিদেয়। 'স্ট্রাইহক' শেষ হলেই কয়েক বালতি জল ঢেলে সাপটাবে থালাখানেক ভাত। নিতাই তখনই হাজির হয়ে বলে—ঝুন্টা রে, যা বাবা একবার পার্থপুর। চট করে। একখান জানলার অর্ডার, ফিট কইর‍্যা আয়।

—এখন? খিদেয় মরে যাচ্ছি।

—না করিস না বাবা! যাবি আর আবি। এক-খান জানলা মাত্তর।

—বিকেলে হবে, কাকু।

—এক্কেবারে চামার পার্টি···সকাল থিকা ডেলিভারির তাড়া···পয়সা দিলে তো তর সয় না। যা বাবা, যা। এক্কেবারে তগ ওই মটরসাইকেলটার মতো।

গোমড়ামুখো ঝুন্টুকে ছেড়ে, নিতাই হেডমিস্ত্রিকে বলে—অনাদি, টাকা নিয়া যাও তুজন···রিকশায় যাতায়াত করবা···চা-বিস্কুট খাইও পথে। ঝুন্টা যাচ্ছে তোমার সঙ্গে।

এরপর ঝুন্টুর বাপের সাধ্যি নেই অমত হওয়ার, নিতাই জানে। গম্ভীর মুখে ভেতরে চলে গেল সে। পার্থপুর মাইল তুয়েক দূরের ক্রমবর্ধমান এলাকা। ফিরে আসতে বেলা তিনটে। রাস্তার টিউবওয়েলে কাক-চান সেরে ঝুন্টু যখন খেতে বসল মালিক জাতের প্রতি চণ্ডক্রোধে মাথাটা বুঁদ। দলাপাকানো নরম ভাত আর শুধু লাউশাকের ঝোল পেয়ে থালাটা ধাক্কা দিয়ে বলে—রোজ-রোজ এই খাওয়া? শুধু আমার জন্য?

ভয়ে পারুল জবাব দেয়—আমি তো শাকও পাই নাই।

ঝুন্টু অন্নু-মন্নুকে জেরা করে—সকালে দোকানে কেউ যায় নাই? চুপ করে আছিস যে?

—আর কিছু হয় নাই। অন্নু-মন্নুর জবাব পেয়েই ঝুন্টু ফুঁশে ওঠে—ওই তো পেঁয়াজের খোসা! হয় নাই মানে?

অন্নু বলে—কাঁকড়ার ঝোলের জন্য। বাবা খাবে।

—কাঁকড়া? ঝুন্টু বিস্মিত। লোকটাকে কাঁকড়া খাইয়ে মারার ফন্দি? সম্পত্তি? সম্পত্তি খাবি? দাঁড়া, খাওয়াই জন্মের শোধ!

পারুল চুপচাপ প্রমাদ গনে।

—মা-গী! দৌড়ে ঝুন্টু ঝোলের কড়াইটা ছুঁড়ে মারল উঠোনে। —বাবাকে মারতে চাস, না? ঘর-বাড়ি হাতাতে পারবি তাহলে?

পারুল দুর্বল প্রতিবাদ করল সামান্য—'লোকটা হার্টফেল করবে। পায়ে পড়ি! আমি তোর মা।' অন্নু-মন্নু ভয়ে কেঁদে ফেলল দাদার মারমুখী মূর্তিতে। হুঙ্কার-চিৎকারে কৌতূহলী পড়শিদের উঠোন ঘিরে ভিড়। শ্রীপতি লেপের মধ্যে বিড়বিড় করছে—পাগোল! বুদ্ধি আছে কারও? কে কী হাতাবে?

দিশেহারা মেয়েদুটো ছুটে পাঁচ-সাত ঘর দূরের তরু পিসিকে ডেকে আনল। এ পাড়ার সার্বজনীন দিদি-মাসি-পিসি—ছেলে-ছোকরারা আড়ালে বলে ডিসকো বুড়ি। পড়শিদের রোগশয্যায় সেবাযত্নের তুলনা হয় না তরুবালার। গত রাত্রে শ্রীপতির যখন অন্তিম অবস্থা—পারুল ছুটে গিয়েছিল। সারা রাত শ্রীপতির শিয়রে বসে মালিশ আর সেঁক দিয়েছিল আর 'ঠাকুরকে ডাকো বৌ! ভয় নাই। ঠিক হয়ে যাবে'—পারুলকে দিয়েছিল সান্ত্বনা। ঝাড়াঝাপটা পন্টবাদিতায় ওর কাছে পার পায় না কেউ। রাজনৈতিক নেতারাও ভোটের সময় অঞ্চলে ঢুকলে প্রথমে ওঠে তরুবালার ঘরে। রিলিফ, সাহায্য এবং দাবিদাওয়ার মিছিলে বুড়ি প্রথমে। চেঁচামেচিতে ও ভেবেছিল শ্রীপতির এন্তেকাল ঘটে গেছে। হাজির হয়ে প্রথমেই পড়শিদের উটকো ভিড় পাতলা করল, তারপর পারুলকে তু-চারটে সান্ত্বনার কথা বলতেই, 'আমি নাকি সম্পত্তি খেতে পড়ে আছি' বলে রুদ্ধ গ্লানিতে পারুল ভেঙে পড়ল ওকে জড়িয়ে। ঝুন্টু গোঁ হয়ে দূরে পড়শিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে। যারা এ পরিবারটিকে চেনে ঝুন্টুর অন্যায় অত্যাচারে ক্ষুব্ধ। এগিয়ে আসে না যদিও। আর তু-একজন উৎসাহী উশকে দেয়ার আনন্দে ঝুন্টুর সমর্থনের আশায় ফুট কাটল—শুধু-শুধু মাটি কামড়ে পড়ে আছে? বিনা স্বার্থে? কিসের টান?

তরুবালার শক্ত পরিচালনায় ক্রমে পরিস্থিতি শান্ত, মিটমাট। বিকেলে বোঝা গেল না বাড়িতে কিছু ঘটেছিল। শুকনো ঝোলের দাগ তোলা হল গোবর দিয়ে, কড়াইয়ের তেলহলুদ ঘষা-মাজা, শ্রীপতিকে বাইরে আনা প্রস্রাব করাতে—সবকিছু স্বাভাবিক; এমনকী দিনের আলো ফুরিয়ে যেতেই ঠাকুর-আসনে ছোট্ট তেলপ্রদীপ, শাঁখে ফুঁ এবং গলায় আঁচলসহ গড়-প্রণাম করল পারুল। প্রতিদিন এইটুকু নিবিড় আত্মসমর্পণের শান্তিতে, সে আশা করে দিন কি বদলাবে না?

আজও সন্ধ্যার কুয়াশা ও ফিকে অন্ধকারে নীল মশারির নীচে তন্দ্রাগ্রস্ত শ্রীপতিকে ঘিরে টুকটাক গৃহকর্ম সারতে-সারতে, ঝুন্টুকে ক্ষমা করে দিল। হোক সে নকল জননী, অন্নু-মন্নু, ঝুন্টুর ছেলেবেলা—বিশেষ করে মেয়েদুটোর—পারুলের হাতেই পার হয়েছে। খাওয়ানো, শোওয়ানো, গু মুত পরিষ্কার—কত কী! এই কলোনিতেই পেটের ছেলে মাকে ঝেঁটিয়ে তাড়াচ্ছে, তুলনায়, ঝুন্টু অনেক ভালো। কিন্তু কিছু পড়শির মনে ঈর্ষা কেন? পারুল কী স্বার্থে পড়ে আছে? সঠিক উত্তর নিজেও জানে না। আজ প্রশ্নটা নিয়ে নিজেই উত্তর খোঁজে। কোন্ বন্ধনে জড়িয়ে আছে এখানে? বিয়ের দিন থেকেই জানে মানুষটা নড়বড়ে, চোখ বুঝলেই পর্ব শেষ। ভবিষ্যৎ গোনা গাঁথা। তবে কি নিশ্চিন্তে জীবনের কটা দিন ভুবেলার অন্ন? পেট ভরে তাও বা জুটছে কই! নারীত্ব? স্বামী-সঙ্গ? লজ্জা! পাপচিন্তা করতে নেই! তবু আজ ভর সন্ধ্যায় মনে পড়ে দিন দশ-বারোর বেশি সহবাস করতে পারে নি স্বামীর সঙ্গে। ত্রিশ বছরের আইবুড়ি মেয়ের শুভবিবাহের পর, একমাত্র যৌতুকের ফুলকাটা তোরঙ্গসহ রিকশা থেকে যখন তুটি প্রাণী মাত্র নেমেছিল এ বাড়িতে, শ্রীপতির বয়স পঞ্চাশ।

হাঁপানি আর হৃদ্‌যন্ত্রণায় ভগ্ন শরীর। দু-চারজন বউ-ঝিয়ের মুখে কাপড় দিয়ে হাসি। উলু দেওয়ার কেউ নেই—একমাত্র বিধবা তরুবালা। জীবনের প্রথম মধু-রাতে আবেগের প্রবল চাপে রুগ্ন খাঁচাটা মট-মট শব্দ করতেই, হাঁপায় শ্রীপতি। পারুলের খেদ ছিল না। জীবনে ইচ্ছা-অনিচ্ছার মর্যাদা কোনোদিন পায় নি সে। ছ বছরে বাপ-মাকে খেয়ে মামাবাড়ির চব্বিশটি বছর তাকে শিখিয়েছে চাইতে নেই কিছু জীবনে। কেবল দশ-বারো বছর পর্যন্ত—দিদিমা বেঁচে থাকতে—সারাদিন সে খেয়েছে কিনা বুড়ি জানতে চাইলে, চোখ ফেটে জল আসত। দিদিমার পরই, তখন পারুলের দ্বিতীয় আশ্রয় ছিল আকাশ। আকাশের দিকে গোপনে চাইলেই চোখের জল থেমে যেত। দিদিমা উপদেশ দিত, আকাশ ঠাকুর-দেবতাদের স্থান। পুণ্যবানের আত্মা আকাশে আশ্রয় নেয়। পাপীদেরটা প্রেতলোকে।

এইসব ভাবনায়, কত রাত হয়েছে, পারুলের খেয়াল ছিল না। অনু-মনুর ছেঁড়া ফ্রকে সুঁচের ফোঁড় দিতে-দিতে হঠাৎ টের পেল দরজা খোলা, হিম জাগছে, দূর মাঠে দিদিমার মুখ কুয়াশায় একাকার। সারাদিন উপবাস, মুখ বুজে কাজ, দুপুরের দিকে মেয়ের আর হাত-পা চলে না। পেটে জ্বলছে আগুন। এক কৌটো তিল দিয়ে সংমা বলল, জাঁতায় কুটে রাখ। ফিরে এসে ভাত দেব।

কোথায় কুয়াশা? কার মুখ? শ্রীপতি ঘুনঘুন কোঁকাচ্ছে। পারুল এক কাপ চা করে খাওয়াল—অতিরিক্ত দেড় চামচ দুধ, পথ্য হিসেবে। তারপর, যেন খানিকটা সুস্থ হয়েছে, শ্রীপতি এমন সব কথাবার্তা বলল, পারুল মাথামুণ্ডু বোঝে না। বাজারে তার নাকি কয়েক হাজার টাকা ধার পড়ে আছে, যদি জেনে না রাখে এরা, তামাদি হয়ে যাবে। তারপর একটু রাত বাড়লে, ঝুণ্টু ঘরে ফিরতেই শ্রীপতি বোমা ফাটাল। হাতের ঈশারায় পারুলকে কাছে ডেকে বলে—বাড়ির দলিলখান নামাও। আজ সব সম্পত্তি বিলি করব। পারুল হাঁ। অনু-মনু হতভম্ব।

—বিশ্বাস হয় না?

—কী কও? পারুল জিগ্যেস করে।

—সম্পত্তি থাকলেই অশান্তি। আমি চোখ বুজলেই···

—চুপ করো।

ঝুণ্টু ছুটে নিতাইয়ের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলতে, রহস্যের অবসান হয়। হাসতে-হাসতে সে বলে—কলোনির আবার দলিল! দানপত্র দিছে নাকি সরকার? আজ রাত্তিরটা সাবধান! টাকা লাগলে কইস।

শ্রীপতির এইসব আপাতবিরোধী কথাবার্তার খবর অঞ্চলের দু-চারজন পুরোনো বাসিন্দারা জানে। নিতাই তাদের একজন। শ্রীপতির নেতৃত্বেই বড়ো রাস্তার পাশে, বিলের ধার ঘেঁসে কলোনিটা তৈরি। জেলে, ঘরামি, কাঠের মিস্ত্রির সংখ্যাই বেশি—তপশিলি—তাই নাম ঠাকুর কলোনি। সরকারি খাস জমিতে জবরদখল। শ্রীপতিই শুধু একঘর বাউন, চারঘর দুঃস্থ সৌকালীন ঘোষ আর দুটো প্লটে মাহিষ্য। প্রতিটি প্লটহোল্ডারদের জন্য সরকারি আইনকানুনের চুলচেরা সাহায্য আদায় করেছিল শ্রীপতি। রোগা দুবলা একটা মানুষ, দিনরাত সিগারেট ফোঁকে, আইনের পরামর্শ দেয়, সরকারি দপ্তরে দরখাস্ত, বয়স্কদের স্কুল, ব্যাঙ্ক থেকে লোন, এলাকাটা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত করানো থেকে শুরু করে বিপদে-আপদে শ্রীপতিই সর্বাগ্রে। নিতাই আর গগন ছিল শ্রীপতির ছায়া। ওই মুদিদোকানটা তো শ্রীপতির সাহায্য আর পরামর্শে। তরুবালা প্রথম-প্রথম ডাকত বাউনঠাকুর। নিজেদের মধ্যে জাত-পাতের প্রশ্ন উঠলেই বলত—এরেই কয় মাতব্বর! বাউন বলে গোমর নাই। কষ্টেসৃষ্টে আছে তো আমাদের নিয়ে! দু-চারজন শিক্ষিত না থাকলে কি পাড়ার সুনাম হয়? তারপর একদিন মিউনিসি-

প্যালিটির অন্তর্গত অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠার পর আচমকা নিতাই বেসুরো ভঙ্গিতে বলে—পাকড়াশিদা, তুমি ঠাকুর কলোনির পিসিডেনট, সরকারি সাহায্য এনে দাও মোদের জন্য, নিজে এক পয়সাও পাও না। এডা ভালো দেখায় না।

—কী আর হবে! ও সাহায্য আমায় সরকার দিতে পারে না।

—পার্টির লোক বলছিল, তালে আর পিসিডেনট হয়ে থাকা কেন! এক যাত্রায় পৃথক ফল যখন···

—তোমরা কেউ হতে চাও?

—আমি না। গগন বিশ্বাস হোক।

গগন প্রতিবাদ করে—আমায় কেন, তুমিই হও নিতাই! দাদা তো রইলেন আমাদের সঙ্গে।

শ্রীপতি একটি কথাও বলে নি সেদিন। তারপর বহু জল গড়িয়েছে নদী বেয়ে। মন্ত্রী এসেছে, খুন-খারাপি হয়েছে, জীবনের পাকে-পাকে জড়িয়েছে রাজনীতি। নিতাই আর গগনের মতো দু-চার ঘরের এখন দোতলা, স্কুটার-মটরসাইকেল হয়েছে। সম্প্রতি নিতাই সরকারি সাহায্যে পাম্প বসিয়ে টিউবওয়েলের জল ছাদের ট্যাঙ্কিতে তোলে।

বাকিরা পুরোনো তিমিরেই। ক্রমে-ক্রমে দু ঘর ঘোষ, জেলে-ঘরামিদের অধিকাংশ কিছু টাকার লোভে জমি হস্তান্তর করে লাইনের ধারে ঝুপড়ি বেঁধেছে, নয়ত রিকশ, ভ্যান টেনেও ভাগ্য ফেরাতে পারে নি। তরুবালা পাকড়াশির কাছে দুঃখ জানায় —গত বষ্যাডা বুঝি নিতাইয়ের উঠোনে হয়েছিল? দোতলা উঠল আর আমরা এক বাঁধ টিনও পেলাম না? সমিতির মিটিংয়ে আপনি বলবেন, এরেই কয় বান্দরের পিঠাভাগ!

অনু-মনুর মার হঠাৎ মৃত্যুর সময় পাকড়াশি শিল্পাঞ্চল এলাকায় ডাকঘরে আসন পেতে মানি-অর্ডার ফর্ম লিখে পেট চালায়। শরীর আরও অসুস্থ। পারুলের মামার সঙ্গে তখন আলাপ। কার্তিক মিত্র —জাতে কায়স্থ। চার বছর বন্ধ চটকলের শেষ সম্বল-টুকু পোস্ট অফিস থেকে তুলে, আত্মহত্যার বাইরে কোনো পথ পাচ্ছিল না। পাকড়াশির সঙ্গে পরিচয়, হৃদ্যতা এবং দুদিনে মামাশ্বশুর বনে যাওয়া। পারুলকে তখন ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচে, তারপর বিয়ে করা বউ বাঁচুক-মরুক আপত্তি নেই। সুতরাং শ্রীপতি বর হিসেবে খারাপ কেন? একটু বেশি বুড়ো? দ্বিতীয় বিবাহ? এমন তো হয় হামেশাই। কথায় বলে, হওন, মরণ, বিয়া—তিন বিধাতা নিয়া! ছেলের আবার রঙ গোত্র বয়স আছে নাকি! সেই থেকে পারুল গু-মুত কাছিয়ে তিন সন্তানকে মানুষ করে, চল্লিশের পরই উর্বরতার আহ্বান স্থায়ী বন্ধ যখন, সমস্ত অপূর্ণতার মধ্যে বাঁধা পড়ে গেল। কেবল ঝুণ্টুর এই স্বভাবপরিবর্তনে ইদানীং অসহায় ভয়ানক।

শ্রীপতি মরল না সে রাতে। পারুল উজাগর রাত কাটাল। তন্দ্রার মধ্যে দিদিমা পাশে বসে রইল—পুরোনো দিনের হাঁটু জড়িয়ে। বাইরে হিম নামল, কুয়াশা জাগল, দিদিমার মুখ হারিয়ে গেল না। বিকেলে সতিন ফিরে এসে দেখে যত তিলের খোসা, তত যেন শাঁস নেই! তুল্য-মূল্য হচ্ছে না। মাথায় আগুন ধরে যায়। নির্ঘাত রাক্ষুসী মেয়ে তিল খেয়েছে মুঠো-মুঠো। রাগে হাতের কাছে ভারি মুগুরটা পেয়ে বসিয়ে দিল মাথায়। মেয়েটা গেল মরে।

ভোরের প্রথম কাকডাকার অনেক পর, কুয়াশার রঙবদলের সূচনায় দেখা গেল শ্রীপতির বুকের লেপ সামান্য ওঠা-নামা করছে।

দুমাস পর একদিন। মৃত্যুর নির্দিষ্ট ঘোষণা নেই বলেই, দুপুর থেকেই পারুলের মনে হচ্ছে দিনটা অশুভ। আজ সারাদিন পাকড়াশি মুখে তোলে নি কিছু। দেহ শীতল, নাড়ী দীর্ঘলয়ে। কোনু ভরসায় পড়ে আছে এখানে—আজকাল এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়তির ওপর ছেড়ে দিয়েছে। অথচ পারুল জানে দু-বেলা নিশ্চন্ত আহার, অর্থ, সাজগোজের বিনিময়ে যে-কোনো গেরস্থবাড়িতে তার দাম আছে। সারাদিন এখানে যে ভূতের খাটনি—অর্থের বিচারে তা অনেক।

তাহলে পারছে না কেন? বাপের বাড়ি বলতে কেউ নেই আজ, শ্রীপতির এই অবস্থা, ঝুণ্টুর হুমকি! তবে কি ছেলে-মেয়ের টান? নিজে ফ্যান চুমুক দিয়েও ওদের মুখে ছুটো ভাত তুলে দিলে খুশি হয়। আজ-কাল অকারণে কান্না উথলে ওঠে। কার জন্য, পারুল জানে না। গত ছুটো মাস একঘেয়ে অনুবর্তনে কেটেছে। বিকেলের আসরে আরতিকে নিয়ে টিকা-টিপ্পনি, ওর কপালে সিঁদুর কেন, বর কোথায়, কেমন দেখতে, আদৌ সে বর কিনা। ঝুণ্টু মাসে একদিন উপার্জনের পয়সায় মাংস কিনে এনেছিল, এই ঔদার্য পল্লবিত হয়ে পরিবেশন হয়েছে। পেটের ছেলের হাতে লাথখাওয়া মায়েরা ঈর্ষায় জ্বলে, পারুলের খুব মজা।

ছমাস পরের সেই একটি দিনে, হঠাৎই বদলে গেল সব। শ্রীপতির নির্ধারিত মৃত্যুর দিনটি ছুপুরের পর থেকেই যখন অমোঘ হয়ে উঠছে, ঝুণ্টু কোত্থেকে ছুআঁটি সতেজ পুষ্ট কচুরলতি নিয়ে হাজির। মেঝেতে ফেলেই বলল—সরষের ঝাল হবে। চিংড়ি এনে দিচ্ছি।

পারুলের দেহ বইছিল না। অনু-মনুকে বলে কুটবার জন্য, ওরা দায় চাপায় মায়ের ওপর। বাবার এ অবস্থায় অন্য কোনো কিছুতে আকর্ষণ নেই। গেল ঘণ্টা ছুই এভাবে। মাছ নিয়ে ফিরে ঝুণ্টু দেখে আঁটিজোড়া একভাবেই পড়ে আছে। ঠেলাঠেলি চলছে মা-মেয়ের মধ্যে। হঠাৎ উন্মাদ হয়ে উঠল সে। খুব খিদে পেয়েছিল তার?

—ঠেলাঠেলি? কাজ নিয়ে ঠেলাঠেলি? দাঁড়া।

সাধের কচুরলতি হিঁচড়ে ফেলে, দরজার লাঠিটায় পারুলের কোমর ঠেলতে-ঠেলতে 'বেরো। বেরো। সম্পত্তি খেতে আগলে আছিস?' বলে একেবারে বারান্দায় তাড়িয়ে নিয়ে আসে। শ্রীপতি চিৎকার-চেঁচামেচিতে নীরব চোখ ফেলল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে পারুল শান্ত গলায় বলে—ঝুণ্টা, মারে কী বলিস? শ্রীপতি অস্পষ্ট ঠোঁট নাড়ল—থানায় যাও। পুলিশ ডাকো!

—পুলিশ? থানা? যা, যেখানে পারিস। ওরা দিন-রাত পাহারা দেবে? চল্লাম আমি, রাতে ফিরে খুন করে রাখব তোকে। কোন্ পুলিশ তোরে বাঁচায়, দেখি! কী সরিয়েছিস অ্যাদ্দিন? দড়াম করে রহস্যময় আমকাঠের আলমারিতে লাথি ঝাড়তেই, পুরোনো পাল্লা ভেঙে গেল মচাং। আক্রোশে সব কিছু টেনে বার করলেও, প্রত্যাশিত মণিমুক্তো খুঁজে পেল না কিছু।

—দাঁড়া! দাঁড়া! ফুঁশতে-ফুঁশতে ঝুণ্টু বাইরে চলে গেল।

ভয়ে আজ অনু-মনু চিৎকার করল না প্রতিবেশী-দের উদ্দেশে। বাপের পাশে বসে রইল চুপচাপ। টের পেল না পারুল ঘরে ঢোকে নি। সে তখন সোজা রাস্তা ধরে অন্ধকার শর্টকাট পথে বড়ো রাস্তায়। ওপাশে বিল—একদিন কাঁকড়া ধরেছিল। এই মুহূর্তে কোনো স্মৃতি নেই মনে। কেন সে পড়ে থাকবে ওখানে? সারাজীবন কিছু চায় নি, পায়ও নি। ভুতের খাটুনির বদলে পরাধীনতায় অন্য বাড়িতে অনেক আদরে থাকতে পারবে। এ পৃথিবীতে কানাকড়ি কোনো দাম নেই তার?

সরু রাস্তার ছুপাশে বাবলাগাছ। দীর্ঘ নয়। বছর তিনেক হল ক্লাব ও পার্টির ছেলেরা লাগিয়েছে। কুয়াশা জমছে হেমন্তরাতে। পোকা ডাকছে মাটির ফাট-ফাটল থেকে। এ পথে দ্রুত হাঁটা যায় না। বিলের বুক বেয়ে আসছে হিম হাওয়া। পায়ে-পায়ে দিদিমার মৃদু গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিল। সতিনের কী মনে হতে, তিলের খোসা আর শাঁস ওজন করে দেখল ঠিক-ঠাক। পাল্লার উভয়দিক সমান ভাবে পুরণ ছিল। দেখেই সতিন বিলাপ শুরু করল, এ আমি কী করলাম! এ পাপে মুক্তি কোথায়! প্রায়শ্চিত্তের জন্য, তিলের সমস্ত খোসাগুলো উপুড় করে গায়ে ঢেলে দিতেই, কালো তিলবর্ণের ছিট নিয়ে ঘুঘু হয়ে গেল। জানলায় উড়াল দিয়ে জন্মজন্মান্তর কাঁদছে, সতীঝিলো—পু-র! পু-র! তুমি শুনতে পাও, ঘুঘুরু!

মহাপাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য সতিন আকাশে উড়েছিল, পারুলের কী খালন করার আছে? বুঝতে পারে না। তার তো পাপ করারও ভাগ্য নেই, অথচ এই মুহূর্তে আকাশে উড়ে যাবার বড্ড সাধ। ঘুরপাক খেয়ে ফের বাড়ির সামনে যখন হাজির, অনু-মনু অথৈ কাঁদছে। জমছে কিছু মানুষ।

ঠাকুর কলোনির শ্রীপতি পাকড়াশির এন্তেকাল হয়েছে কিছু আগে।

উপসাগরীয় সংকটের পটভূমি

আবদুল ওয়াহাব মাহ্‌মুদ

উপসাগরীয় অঞ্চলের সংকট আজ মানবসভ্যতা-বিধ্বংসী এক ভয়াবহ যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের আশীর্বাদপুষ্ট বহুজাতিক বাহিনী মার্কিনিদের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের 'মহান লক্ষ্য' কুয়েতকে ইরাকের কবলমুক্ত করা। ৩৫ দিন ধরে ইরাকের ওপর চলেছে অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ। হাসপাতাল, জনবসতি, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন—সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে হাজার-হাজার টন বোমার ঘায়ে। আল-আমেরিয়ার বাঙ্কারে আশ্রয় নেওয়া নারী-শিশু-বৃদ্ধরাও রেহাই পায় নি মার্কিন শক্তিশালী লেসার বোমার আক্রমণ থেকে। সভ্যতার পীঠস্থান বাগদাদ শহর আজ এক ধ্বংসস্তূপ। সোভিয়েত শান্তি-প্রস্তাবকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশ নির্দেশ দিয়েছেন ভয়াবহ স্থলযুদ্ধের। দু-দিন স্থলযুদ্ধ চলার পর যখন বাগদাদ রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয়, তারা কুয়েত থেকে সেনা সরিয়ে নিচ্ছে এবং রাষ্ট্রসংঘকেও তা জানানো হয়, তখনও যুদ্ধোন্মাদ মার্কিনিরা সন্তুষ্ট নয়। সাদ্দাম নাকি তাঁর ঘোষণায় যথেষ্ট আন্তরিক নন। সুতরাং সর্বশেষ খবর অনুযায়ী মার্কিনিরা স্থলযুদ্ধ জারি রেখেছে এবং কুয়েত থেকে সরে-আসা সেনাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

কিন্তু কেন এই যুদ্ধ? এই সংকটের উৎসই বা কী? কেনই-বা আরব দুনিয়া থেকে হাজার মাইল দূরের দেশ আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কদের উপসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে এত মাথাব্যথা? এসব সওয়ালের জবাব আমাদের অনেকের কাছেই খুব একটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু উপসাগরীয় সংকটের এই চরম সময়টিকে বুঝতে গেলে আমাদের একটু পেছনে তাকাতে হবে। ওলটাতে হবে ইতিহাসের পাতা।

প্রবীণ অধ্যাপক মাহ্‌মুদ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ তারিখে 'চতুরঙ্গ'-র কর্মীদের সঙ্গে যে আলোচনা করেন, এই রচনাটি তার অনুলিখিত রূপ। অনুলেখক প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়।

আজকের আরব দুনিয়া এবং উপসাগর অঞ্চলের যে মানচিত্র, তার বদল ঘটেছে বার-বার যুগে-যুগে কালে-কালে। পবিত্র জেরুজালেম নগরীর ওপর দখলদারি নিয়ে ধর্মযুদ্ধের (ক্রুসেড) কথা তো সবারই জানা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এ-অঞ্চল ছিল অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের অধীন।

এই প্রসঙ্গে ইহুদিদের কথাও একটু বলে নেওয়া যাক। ইহুদিরা মোজেসের 'প্রতিশ্রুত দেশ' (promised land)-এর স্বপ্ন দেখতে থাকলেও, বাস্তবে তাঁরা নিজেদের দেশ বলতে যা বোঝায়, কোনোদিনই তা পান নি। অনেকে মনে করেন প্যালেস্তাইন থেকে ইহুদিদের বুঝি মুসলিমরাই হটিয়েছেন। বাস্তব ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। ইহুদিরা প্যালেস্তাইন থেকে বহু আগেই বিতাড়িত হয়েছেন রোমানদের হাতে। খ্রীষ্টানরাও ভয়ানক ইহুদি-বিদ্বেষী। কারণ খ্রীষ্টের মৃত্যুর কারণ হিসেবে তাঁরা ইহুদিদেরই দায়ী করেন। ইওরোপময় ইহুদিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও, সবদেশেই তাঁরা অনাকাঙ্ক্ষিত। সামাজিক মর্যাদা বলতে কিছুই তাঁদের নেই। শহরগুলোর প্রধান জনবসতি থেকে তাঁদের আলাদা করে রাখা হত ঘেটোয় (বস্তিতে)। এখনও ইওরোপ-আমেরিকার সমাজে ইহুদি-বিদ্বেষের চোরাস্রোত কীভাবে বয়ে চলেছে তা মার্কিনিদের লেখা সাহিত্যকর্মে চোখ বুলোলেই নজরে পড়বে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির শরিক ছিল তুর্কিরা, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য। ১৯১৭-তে লর্ড বেলফোর ইহুদিদের পিতৃভূমি (promised home-land)-র কথা ঘোষণা করেন। আরব শেখদের কানে-কানে ব্রিটিশ-মার্কিনিরা ফুসমন্তর দেয়—তোমরা কেন তুরস্কের অধীন হয়ে থাকবে? ইওরোপ-আমেরিকার নায়ক লরেন্স (যাকে নিয়ে নামকরা চলচ্চিত্র লরেন্স অব আরাবিয়া) আসলে একজন গুপ্তচর। এই গুপ্তচরের সহযোগিতায় মক্কার ইমাম এবং আরব দলপতিদের নিয়ে ব্রিটেন-ফ্রান্স আর জারশাসিত রাশিয়া এক গোপন চুক্তি করে তুর্কিদের বিরুদ্ধে। এই চুক্তি সাইক্স-পিকো (Sykes-Picot) চুক্তি নামে খ্যাত। লর্ড কার্জনও এই চুক্তির কথা জানতেন। নভেম্বর বিপ্লবের পর এই চুক্তির দলিল-দস্তাবেজ সোভিয়েত সরকারের হাতে আসে তারা গোপন চুক্তি ফাঁস করে দিলে পাশ্চাত্যের একদল চুক্তির কথাটা বেমালুম উড়িয়ে দেয়। বলে, এসব বলশেভিকদের বানানো আষাঢ়ে গল্পো। আর-একদল বুক বাজিয়ে জানায়—হ্যাঁ, আমরা করেছি এই চুক্তি। আরব দুনিয়াকে তুর্কিদের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছি, খারাপটা কী?

ইওরোপ-মার্কিন মুলুকের অভিবাসী ইহুদিরা দলে-দলে আসতে থাকেন তাঁদের প্রতিশ্রুত 'পিতৃভূমি'তে। আমেরিকায় ইহুদিদের এক শক্তিশালী গোষ্ঠী আছে। তাঁরা ধনবলে বলীয়ান। তাঁদের অর্থসাহায্যপুষ্ট ইহুদিরা এসে জেরুজালেম এবং প্যালেস্তাইনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেন। গরিব আরব কৃষকদের (ফেলাহি) থেকে অবিশ্বাস্য বেশি দামে জমি কিনে-কিনে গড়ে ওঠে অভিবাসী ইহুদিদের জনবসতি। গুণ্ডা লাগিয়ে আরবদের মারধোর করেও তাদের জমি থেকে উৎখাত করা হয়।

মোটামুটি এরকম সময় থেকে আরব দুনিয়ার গলানো সোনা খনিজ তেলের সন্ধান মেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পতন ঘটে তুর্কি সাম্রাজ্যের। তাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দেওয়া হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিশ্বের চোখে মহান সাজলেন—আর কোনো দেশকে কেউ দখল নিতে পারবে না—এই ঘোষণা করে। তবে তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ইউনিবেশগুলোর ওপর থেকে ব্রিটিশ-ফরাসি একাধিপত্য খর্ব করা। কারণ ততদিনে মার্কিনিরা আরব তেলের গন্ধ পেয়ে গেছে। সেজন্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (লীগ অব নেশনস) ঘোষণা অনুযায়ী টুকরো-টুকরো তুর্কি সাম্রাজ্যের এক-একটা টুকরো এক-এক ঔপনিবেশিক শক্তির দায়িত্বে (ম্যানডেট

পাওয়ার) অর্পণ করা হল। যেমন লেবানন-সিরিয়ার ম্যানডেট পেল ফ্রান্স। প্যালেস্তাইন-ইরাক পেল ব্রিটিশরা। আফ্রিকার জাইরে (অধুনা নামিবিয়া) পেল দক্ষিণ আমেরিকা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার—তখনও কুয়েত নামে কোনো দেশ আরব দুনিয়ার মানচিত্রে আসে নি। তখনও কুয়েত ইরাকের একটি জেলা বসরার অন্তর্গত।

আরব অঞ্চলে ইহুদিদের প্রতিশ্রুত পিতৃভূমির দাবিকে শক্তপোক্ত করতে ইহুদি-প্যালেস্তিনীয়দের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো হয়। ১৯৩০-এর এই দাঙ্গার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদতদাতা ছিল পাশ্চাত্য শক্তি। ১৯৩৬-এ এক আরব প্রতিনিধিদল ব্রিটেনে যান এই দাঙ্গা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন এক ইহুদি। তাঁদের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় এই দাঙ্গায় ৬০০০ হাজার আরবকে ঠাণ্ডা মাথায় কোতল করা হয়েছিল। এই দাঙ্গা যে পাশ্চাত্য-শক্তি-প্ররোচিত তার একটি প্রমাণ ভারতের কুখ্যাত পুলিশ-বড়কর্তা টেগার্টকে এই সময়ে প্যালেস্তাইনে বদলি করা হয়।

আরো বেশি-বেশি করে তেলের খোঁজ মিলতে থাকে আরব দুনিয়ায়। পশ্চিমিরা ম্যানডেট পাওয়ারের সুযোগে সেখানে খুলতে থাকে একের পর এক তেল কোম্পানি। আরবের গলানো সোনায় ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে পশ্চিম দুনিয়া।

এসে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হিটলারের ইহুদি-ঘৃণার আগুনে জবাই হন ৬০ লক্ষ ইহুদি। দুনিয়া জুড়ে যে ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতি জাগবে সেটাই স্বাভাবিক। এখানে একটা কথা না বললে নয়—যে হিটলার ব্রিটেন-ফ্রান্স-আমেরিকার হাতে তৈরি সোভিয়েত-ক্ষমতাকে চূর্ণ করার জন্যে, তাঁর ইহুদি-ঘৃণার কথা (যা তিনি খোলামেলাই 'মাইন ক্যাম্ফে' লিখে গেছেন) পাশ্চাত্য শক্তির জানা ছিল না, এ-কথা মেনে নেওয়া খুবই শক্ত। ইহুদিদের জন্যে পাশ্চাত্য শক্তির দরদ যে কুমিরের চোখের জল, সেটাই বলবার কথা।

ইহুদিদের প্রতি বিশ্বের সহানুভূতির পুরো সুযোগ নেয় মার্কিনিরা। শুরু হয় ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের তোড়জোড়। জার্মান-ব্রিটিশ-ফ্রান্সের ইহুদিদের, বিশেষ করে মার্কিন ইহুদিদের, সেসব দেশে স্বাধিকারের মর্যাদা না দিয়ে তাদের দলে-দলে চালান করা হয় ইজরায়েল-নামক ভূখণ্ডে।

বলা ভালো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আমেরিকা সব-থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে দেখা দেয়। কারণ বিশ্বযুদ্ধে ইওরোপের দেশগুলির ক্ষয়ক্ষতির কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সোভিয়েতের জনবল, অর্থবল, কৃষি, শিল্প—সবকিছুই ছিল বিপর্যস্ত। ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইতালি-জার্মানিদেরও হতদশা অবস্থা। একমাত্র আমেরিকার গায়েই আগুনের আঁচটুকুও লাগে নি, ওই পার্ল হারবার ছাড়া। তার শোধও অবিশ্যি তারা কড়ায়-গণ্ডায় বেশি বুঝে নিয়েছে নাগাসাকি-হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলে।

সেজন্যে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের মূল উদ্যোগটা ছিল মার্কিনিদেরই হাতে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, আরব দুনিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানই এমন যে এখানে যদি একটা তাঁবেদার রাষ্ট্র আর পুতুল সরকার থাকে তবে তার মাধ্যমে আরব-তেল এবং আফ্রিকার ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা যায়। বিশ্বযুদ্ধের পরের ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিস্থিতিতে সোভিয়েতের ওপরও নজর রাখা যায়। ১৯৪৮-এর আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী শুরু হয় প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল সীমানা নির্ধারণ। বলা বাহুল্য, জোর করে বেআইনিভাবে প্যালেস্তাইনের অনেক জমি ইজরায়েলের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। জেরুজালেম নগরীর ওপর প্যালেস্তিনীয়দের কোনোরকম অধিকারই থাকে না। ইজরায়েলের রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা আসে, তারা পশ্চিমিদের বশংবদ ৩০-এর দাঙ্গার কুখ্যাত পাণ্ডারা আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ।

লীগ অব নেশনস-এর দেওয়া ম্যানডেট পাওয়ারের মেয়াদও শেষ হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধশেষে। ফলে স্বাধীন হয়ে যায় আরবের অনেক দেশ। ইরাক, প্যালেস্তাইন, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ইয়েমেন, কাতার, ওমান ইত্যাদি। বলবার কথা এই দেশগুলোর অধিকাংশের ভৌগোলিক সীমা কোনো জাতিগত সংগ্রামের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নি। হয়েছিল পশ্চিমিদের, বিশেষ করে তেল কোম্পানিগুলোর কর্তৃত্ব বজায় রাখার কথা ভেবে এবং ইজরায়েলের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করতে। না হলে একটা নদীর (জর্ডান) নামে আস্ত একটা দেশ তৈরি হতে পারে?

তবে মিশর, পারস্য (ইরান), সিরিয়া, এবং তুরস্কে কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রামের উন্মেষ ঘটে প্রথম-বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকেই। এই খুদে-খুদে দেশগুলোর ক্ষমতা দেওয়া হয় আরব শেখ-আমির-ওমরাহদের হাতে। ইরাকের রাজা, সৌদির-রাজা, ছোট-ছোট আমিরদের সংযুক্ত আরব আমির-শাহী, এরা সব পশ্চিমিদের একান্ত অনুগত শাসক।

এইসব শাসকরা দেশের মানুষের উন্নতির কথা একটুও ভাবত না। দেশের সম্পদকে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করত। এবং দেশের মানুষের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তাদের একটুও বাধত না। তেলের পয়সায় তারা মধ্যযুগের রাজা-রাজড়াদের মতো দিন কাটাত আমোদ-প্রমোদ-বিলাসব্যসনে। তাদের সে জীবনযাপনের ধরন এখনও কিছুই প্রায় বদলায় নি।

প্যালেস্তাইনের সঙ্গে ইজরায়েলের বিবাদ চলতেই থাকে। মিশর ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ায় এবং হেরে যায়। নিজভূমে পরবাসী প্যালেস্তিনীয়রা মাথা কুটে মরে রাষ্ট্রসংঘের দরবারে। কিন্তু আরব দেশগুলোর অনৈক্যের সুযোগে মার্কিন মদতে ইজরায়েল ক্রমেই সেখানে শক্ত ঘাঁটি গাড়তে থাকে। মিশরের পরাজয়ের পর তারা রাষ্ট্রসংঘের সনদ উপেক্ষা করে গায়ের জোরে জর্ডানের পশ্চিম তীর এবং গাজা অঞ্চল দখলে রাখে। তা আজও তাদের অধিকারে।

ম্যানডেট পাওয়ারের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়ে আরব দেশগুলি যখন স্বাধীন হয়, তখনও কিন্তু কুয়েত ইরাকেরই অংশ। পরবর্তী কালে তেলের লোভে ব্রিটিশ-মার্কিন স্বার্থে এক আফ্রিকান আমিরকে গদিতে বসিয়ে কুয়েতকে ইরাক থেকে আলাদা করা হয়। রাষ্ট্র হিসেবে কুয়েতের আবির্ভাব ১৯৬১ সালে। তেলের ওপর কবজাটা অনেক জোরদার করা যায় যদি উপসাগরের তেলসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোকে খুদে-খুদে রাষ্ট্রে ভাগ করে নেওয়া যায়। সেজন্যেই বাহরিন, কাতার, ওমান, কুয়েতের মতো খুদে রাষ্ট্রের জন্ম। কুয়েত এমন একটা রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা মাত্র ১৫ লক্ষ। যার অর্ধেকের বেশি বাইরের লোক, এসেছে জীবিকার্জনে, যার আবার ৩০ শতাংশ প্যালেস্তিনীয়। তেলের পয়সায় এসব দেশের আমিররা এতটাই ধনী যে কুয়েতের মতো ছোটো একটা দেশ আমেরিকা, সোভিয়েতকে ধার দেয়। পশ্চিমি শিল্পে বিনিয়োগ করে।

কুয়েত সীমান্ত নিয়ে ইরাক এবং সৌদি আরবের সঙ্গে বিবাদ লেগেই আছে। মানচিত্র খুললে সৌদি-কুয়েতের মাঝে একটা নিরপেক্ষ অঞ্চল (neutral zone) দেখা যাবে। সৌদিদের দাবি ওটা তাদের। কুয়েত এবং ইরাকের মাঝে একটা ছোটো দ্বীপ-মতো আছে, যার মালিকানা যৌথ। দীর্ঘদিন ধরে কুয়েত সস্তায় তেল বিক্রি করছে—ব্যারেল প্রতি ১৩ ডলার। মার্কিনিরা সেইসব তেল কিনে চড়া মুনাফায় বাজারে বিক্রি করছে ১৮ ডলারে। এর ফলে ইরাক সহ অন্যান্য আরব দেশগুলোর যে যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়া উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে কুয়েত ভূগর্ভস্থ তেল টেনে নিচ্ছে বেশি-বেশি করে। ফলে ইরাকের তেলভাণ্ডার নিঃশেষিত হচ্ছে দ্রুত। এ অভিযোগও অমূলক নয় মোটেই।

সবশেষে সাতটি বহুজাতিক তেল কোম্পানির কথা বলা দরকার। তার মধ্যে পাঁচটি মার্কিন, একটি

ব্রিটিশ, একটি ব্রিটিশ-ডাচ যৌথ উদ্যোগ। আর-একটি ছোট্ট ফরাসি তেল কোম্পানি আছে। এরাই আরব দুনিয়ায় তেলের খোঁজ থেকে শুরু করে, উৎপাদন, বাজারে বিক্রি পর্যন্ত সব কাজটাই করে। আরব তেলের ওপর এই কবজা খানিক আলগা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল 'ওপেক' (OPEC) গঠিত হওয়ার পর। ১৯৭৩-এর আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের পর ওপেক তেলের দাম চার গুণ বাড়ালে মার্কিনিরা এক সংকটে পড়ে। তারা এমনকী সৌদিকে আক্রমণ করবে বলেও হুমকি দেয়। অবশ্য শেষ পরিণতিতে ওপেক তাদের সামনে কোনো বড়ো চ্যালেনজ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আরব তেলের ওপর পাশ্চাত্য আধিপত্য একটুও কমে নি। আরব পেট্রোডলারের সিংহভাগই জমা পড়েছে পশ্চিমি দুনিয়ার ব্যাঙ্কগুলোতে। তেলের দাম বাড়ার ফলে সাতটি বহুজাতিক কোম্পানির কোনো লোকসান তো হয়-ই নি, বরং ফুলেফেঁপে জমে উঠেছে মুনাফার পাহাড়।

ইরাক কুয়েত দখল করাতে কিন্তু পশ্চিমিদের আরব তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ভয়ানকভাবে কমে যাওয়ার আশঙ্কা। ১৯৭৪-পরবর্তী গবেষণা অনুযায়ী কুয়েতের মজুত তেলভাণ্ডার পৃথিবীর মোট তেলসম্পদের ৯·৪ শতাংশ। সৌদির ৩৪ শতাংশ। ইরাক-কুয়েত মিলে ১৮ শতাংশ। সৌদিতে যেভাবে সাদ্দাম হুসেনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে, তার ফলে যদি সৌদিতে ইরাক-অনুগত কোনো সরকার গঠিত হয় তবে ইরাক পৃথিবীর অর্ধেকেরবেশি তেলসম্পদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। আর উপসাগরীয় আরব দেশগুলো সবকটা যদি ইরাকের নেতৃত্ব মেনে নেয় তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে পৃথিবীর মোট মজুত তেলভাণ্ডারের ৮৫ শতাংশ। এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হোক, এটা মার্কিন এবং অন্যান্য পশ্চিমি শক্তি কখনই চাইবে না। বিশেষ করে যেখানে আমেরিকার তেলভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত।

মোটের ওপর এই ছবিটাই উপসাগরীয় যুদ্ধের পটভূমি। আমরা যুদ্ধের আশুকারণ, যুযুধান পক্ষগুলির ন্যায়-অন্যায় বিশ্লেষণ কিংবা ভবিষ্যৎ ফলাফল বিচারের মধ্যে আপাতত ঢুকছি না। তবে দু-একটি বিষয় যা আমাদের নজরে পড়েছে সেগুলো নিয়ে কিছু বলা দরকার।

প্রথম কথা, কুয়েত দখল করে সাদ্দাম হুসেন নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রসংঘের বিধি লঙ্ঘন করেছেন। এর আগে দীর্ঘ আট বছর ইরানের সঙ্গে অর্থহীন যুদ্ধ করে তাঁর বা ইরাকের কোনো লাভই হয় নি। কিন্তু ইজরায়েলও মার্কিন মদতে গত ২৩ বছর ধরে রাষ্ট্রসংঘের বিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জর্ডানের পশ্চিম তীর এবং গাজা অঞ্চল জবরদখল করে রেখেছে। তার বিরুদ্ধে আজও রাষ্ট্রসংঘ কোনো '১৫ জানুয়ারি ১৯৯১'-এর মতো কোনো ডেটলাইন দেয় নি যে ইজরায়েলকে বেআইনি দখলি জমি ছেড়ে দিতে হবে বা সে-জমি উদ্ধারে তৈরি হয় নি কোনো বহুজাতিক বাহিনী। মার্কিনিরাও অন্তত তিনবার রাষ্ট্রসংঘ-বিধি ভেঙেছেন—পানামা, গ্রানাডা এবং নিকারাগুয়ায়। সেসব ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘ সুকৌশলে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের এই দ্বৈত চরিত্রটি নজরে পড়ার মতো।

দ্বিতীয় কথা, সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি গোরবাচেভ বিশ্বের মানুষজনের সামনে যে 'নতুন চিন্তার' তত্ত্ব পেরেস্ত্রোইকা হাজির করেছিলেন তা যে কী পরিমাণ অন্তঃসারহীন, এই যুদ্ধ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। 'যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নমনীয়তা নাকি পৃথিবীতে শান্তির যুগ আনবে চিরতরে—তাঁর এই অলীক স্বপ্নজাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে বর্তমান যুদ্ধ। এই যুদ্ধ পেরেস্ত্রোইকা-নায়ক গোরবাচেভ এবং চীনের নেতাদের মেরুদণ্ডহীনতা, পাশ্চাত্য শক্তির পায়ে নির্লজ্জ আত্মনিবেদনও প্রকাশ করে দিয়েছে।

তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় নতুন হাওয়া বয়ে যাওয়ায়, বাজার অর্থনীতির দরজা খুলে যাওয়ায়, পূর্ব ইওরোপের শাসকদের একের পর এক পতন

হওয়ায়, পশ্চিমি ধাঁচের সমাজই যে একমাত্র আদর্শ, মানবসভ্যতার চরম উৎকর্ষ, এমন খোলামেলা, স্বাধীন গণতন্ত্র যে আর কিছু হতে পারে না—এরকম একটা ধারণা ছড়ানো হচ্ছিল বিশ্বজুড়ে। সোভিয়েত-চীনসহ বেশির ভাগ দেশই উঠেপড়ে লেগেছিল 'উন্নত সভ্য মার্কিনি কায়দা' রপ্ত করতে। সাদ্দামের জেদ কিন্তু এই 'মুখোশধারী সভ্য' মার্কিনিদের রূপ খুলে দিয়েছে উলঙ্গ করে। সাদ্দাম হারছেন, তা সুনিশ্চিত। তবে বিশ্বজোড়া মানুষজন আজ আর-একবার মার্কিনি ধোঁকার স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন। তথাকথিত 'দেশ-উদ্ধারকারী শান্তির দূতেরা' বিশ্ব-জনমত উপেক্ষা করে কীভাবে নৃশংস জল্লাদে পরিণত হতে পারে তার পরিচয় দুনিয়ার মানুষ আজ অহরহ পাচ্ছেন। স্বার্থে ঘা লাগলে মার্কিন-শাসককুল কী পরিমাণ অসভ্য-বর্বর হয়ে যেতে পারে, এই যুদ্ধে তাদের সেই কুৎসিত রূপটি আবার মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেখানোর জন্যে অন্তত সাদ্দামকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না।

যুদ্ধশেষে বুশ যে 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা'র (New World Order) কথা বলেছেন, তাতে আরব দুনিয়ায় তাদের স্বার্থরক্ষা করবে সৌদি আরব, মিশর, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলো। সাময়িকভাবে দুনিয়া-জোড়া মার্কিন আধিপত্য বজায় রাখার এই যে বর্বর অভিযান, তাকে হয়তো এ-মুহূর্তে রোখা যাচ্ছে না, একথা ঠিক। কারণ জনগণের পক্ষের শক্তি, যা রাজনৈতিক শক্তিতে রূপ নিতে পারে একমাত্র 'out of a barrel of a gun' ('বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতা আনে'—মাও), তার অনুপস্থিতি। মার্কিন যুদ্ধবাজদের প্রতি ঘৃণা উগরে দেওয়ার মতো রাইফেল বা মিসাইল বিশ্বজনগণের হাতে আপাতত নেই। নেই সেই রাজনৈতিক শক্তি। তাই ওদের এত দাপাদাপি। কিন্তু মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন আজ হোক কাল হোক বিশ্ব-রাজনীতিতে পড়বেই ফের। নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রবক্তাদের স্বপ্নের প্রাসাদও যে ভেঙে পড়বে, এমন আশাও অমূলক নয়। কারণ অনেক যুদ্ধবাজ শাসকই তাদের মনমতো এরকম নানাধরনের বিশ্বব্যবস্থা গড়তে চেয়েছিল—চেয়েছিল দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হতে। এবং সময়ে-সময়ে মনেও হয়েছিল—হিটলারদের হাত থেকে আর রেহাই নেই বুঝি পৃথিবীর মানুষের। কিন্তু না, ইতিহাসের চাকা বারবার অন্যদিকে ঘুরেছে। ভবিষ্যতেও তাই, ইতিহাসের চাকা যে মানুষের দিকেই ঘুরবে, তাও ইতিহাসেরই নিয়ম।

সাঁওতালি সমাজ, ভাষা, সাহিত্য এবং এলিট সম্প্রদায়

কে. এল. হাঁসদা

ইংরেজি 'ট্রাইব' শব্দটিকে বাঙলা পরিভাষায় সাধারণত "উপজাতি" হিসেবেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ভারতের অগ্রসর জাতিসত্তাগুলি যাঁরা এদেশে নিজেদেরকে মূলস্রোত (mainstream) হিসেবে উপস্থাপিত করেন, তাঁরা উপজাতি এবং আদিবাসী-দের অভিন্ন মনে করেন। সাম্প্রতিক কালে আদি-বাসীরা "উপজাতি" শব্দটিকে নিজেদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত হুক্কারজনক বলেই মনে করেন। আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায় অ-আদিবাসীদের সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল ধরার বিভিন্ন কারণের মধ্যে এটিও একটি। তাই আদিবাসীদের ক্ষেত্রে বর্তমানে এই উপজাতি শব্দটি কতখানি প্রযোজ্য, তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। তর্ক-বিতর্কের জটিলতায় প্রবেশ করতে চাই না, উপজাতি আর আদিবাসী শব্দ দুটির সংজ্ঞানিরূপণও আমার উদ্দেশ্য নয়। যাই হোক, কালের স্রোতে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি জনসমাজে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী পরিবর্তিত ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও আদিবাসী গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশীদার সাঁওতালরা যে তাদের স্বকীয় সমাজবিন্যাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস সমানে চালিয়ে যাচ্ছে তা লক্ষণীয়। ভারতীয় ইতিহাসে সাঁওতালরা একদিকে সহজসরল মাটির মানুষ, অন্যদিকে কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বাধীনতাপ্রিয়—এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইউরোপীয় মিশনারি এবং ব্রিটিশ শাসকদের রচনায় সাঁওতালদের সম্পর্কে প্রাথমিক ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও স্বাধীনোত্তর কালে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। কিছু-কিছু রচনা প্রকাশিত হলেও তা আবার খ্রীষ্টান পাদ্রী ও ইংরেজ শাসকদের লেখাগুলিকেই ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়। বাঙলা ভাষায় তো নেই বললেই চলে। স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতির ছাপ বৃহত্তর জনসমাজে সাঁওতালরা যতখানি রাখতে পেরেছেন তার চেয়েও বহুগুণে ১৮৫৫ সালে বিদ্রোহের আপোসহীন সংগ্রামী চেতনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান তাঁরা অধিকার করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এদেশের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার অতিরঞ্জনায় আদিম উপজাতির বর্বরতাকেই খুঁজে পেয়েছেন। ভারতীয় ইতিহাস রচনায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল যে আদিবাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসচর্চায় এই ধরনের পক্ষ-পাতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অত্যন্ত সুখের বিষয় হল, মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের চেষ্টায় শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সাথে এই বিদ্রোহগুলির গুরুত্ব এবং তাৎপর্যকে যথেষ্ট যত্নসহকারে আলোচনা করা হচ্ছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের বিদ্রোহীদের অসন্তোষ আর ক্ষোভগুলির মধ্যে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে খাটো করে দেখলে আমার মনে হয় সাম্প্রতিক কালে সাঁওতালি ভাষার অবস্থানকে সঠিক-ভাবে নিরূপণ করা যাবে না। যাই হোক, সাঁওতালি ভাষা ও ভাষাচর্চার পরিচিতি, বর্তমানে এই ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থান কোথায়? ভাষাচর্চা ও সাহিত্য-সৃষ্টিতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন তাঁদের শ্রেণীগত অবস্থান কোথায়? এই ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টিতে যে-সকল সীমাবদ্ধতা ও অন্তরায়গুলি বিদ্যমান

এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সাঁওতালি ভাষাকে কেন্দ্র করে আধুনিক জাতিসত্তা গঠনের যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে আমার এটা অতি সামান্য প্রয়াসমাত্র।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro Asiatic) ভাষা-গোষ্ঠীর মুণ্ডারি শাখাকে উত্তরমুণ্ডা, মধ্যমুণ্ডা, দক্ষিণ-মুণ্ডা ও নিহালী প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হয়। সাঁওতালি ভাষাটি উত্তরমুণ্ডার[১] অন্তর্গত। স্বাভাবিক-ভাবে প্রশ্ন দেখা দেয়—ভারতে এখনও পর্যন্ত যে মুণ্ডা সম্প্রদায় আছেন তাঁদের মুখনিঃসৃত ভাষার পরিবর্তিত রূপই কি সাঁওতালি ভাষা? আবার এই সাঁওতালি ভাষাকে "কোল" শ্রেণীর ভাষা হিসেবেও পরিগণিত করা হয়। কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষাগুলির মধ্যে ফারাক নেই বললেই চলে। সামগ্রিকভাবে এইসকল সম্প্রদায় আদিতে নিজেদের কখনও 'হড়', কখনও 'খেরওয়াল' বলে অভিহিত করতেন। সুতরাং মুণ্ডারি শাখার পরিবর্তে 'হড়' বা 'খেরওয়াল' শাখার নামকরণ কি সমীচীন ছিল না? তবে এটাও ঠিক যে একটি বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি বিশেষ ভাষার সম্পর্ক থাকাটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সর্বদাই যে একটি জাতি বা সম্প্রদায় সেই ভাষাই ব্যবহার করেন, তার কোনো যৌক্তিকতা নাও থাকতে পারে। কিন্তু অযৌক্তিকতার যুক্তি তো থাকে।

প্রচলিত সাঁওতালি কিংবদন্তী থেকে জানা যায় আর্যপূর্ব ভারতে সাঁওতালরা 'খেরওয়াল সভ্যতা'র স্রষ্টা ছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে মুর্মু-পদবিধারী ব্যক্তিরা ছিলেন বিদ্বদ্জন। যাযাবর আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে এই সভ্যতাকে ধ্বংস করেন। আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাঁরা পরাজিত হন এবং বশ্যতা স্বীকার করেন, তাঁরা বর্তমান ভারতীয় জনসমাজে হিন্দুধর্মের নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত। অপর দিকে যাঁরা বশ্যতা স্বীকার করলেন না, তাঁরা নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্য বনাঞ্চলগুলিতে বসতি স্থাপন করেন। এখন কিংবদন্তীগুলিতে ভূরি-ভূরি অলৌকিকতার ছাপ থাকে। এর বাস্তব সঙ্গতির বিচার-বিশ্লেষণ করবেন ঐতিহাসিকরা। তবে কাগজে-কলমে সাঁওতালি ভাষা চর্চায় ইংরেজ মিশনারিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলা ভালো, এ বিষয়ে তাঁরা অচেতনভাবে ঐতিহাসিক শর্ত (unconscious tool of history) পালন করেছেন। সেই যুগের কয়লান গুরু নামে জনৈক প্রভাবশালী সাঁওতালদের ধর্মীয় নেতার সহায়তায় এল. ও. স্ক্রাফরুড় রোমান লিপিতে প্রথম সাঁওতালি ভাষায় "হড়হপন করেন মারে হাপড়াম কওয়া: কাথা" লিখে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশ করেন। তার পরবর্তী কালে বাইবেলের কিছু-কিছু অংশ সাঁওতালি ভাষায় প্রকাশিত হয়। পি. ও. বোডিং এবং তাঁর শিষ্যরা যখন সাঁওতালি উপকথা সংগ্রহের জন্য সাঁওতাল গ্রামগুলিকে পরিক্রমা করেন তখন থেকেই সাঁওতালদের মধ্যে এক অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হতে থাকে। জে. ফিলিপ, ক্যাম্পবেল প্রমুখ পাদরিরাও সাঁওতালদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে সাঁওতালি ভাষা চর্চার কাজে আগ্রহী ছিলেন। এমন-কী বোডিং ও ক্যাম্পবেল সাহেব সাঁওতালি থেকে ইংরেজি ভাষায় অভিধান পর্যন্ত রচনা করে যান। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে সাঁওতাল-দের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে ভাষা ও সাহিত্য চর্চার উন্মেষ ঘটতে থাকে। বিশেষত অ-খ্রীষ্টান সাঁওতালরা রোমান হরফকে পরিহার করার প্রয়াস চালাতে থাকেন। সাঁওতালি ভাষা উচ্চারণের সাযুজ্য রক্ষা করেই স্বকীয় ভঙ্গিমায় সাঁওতালি হরফ আবিষ্কারের উদ্যোগও শুরু হয়। সর্বোপরি সাধুরাম চাঁদের আবিষ্কৃত হরফটি "মজদাঁধের" নামে পরিচিত। বিভিন্ন কারণে এটি সাঁওতালদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভে অসমর্থ হলেও তাঁর লিখিত "সংসার কেন্দ" নাটক ও "লিটাগড়েৎ" কাব্যগ্রন্থটি সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে বহুলাংশে সহায়তা করে। রামদাস টুডুর 'খেরওয়াল বংশ ধরম পুঁথি' এই ভাষার সজীবতাকে সমৃদ্ধিশালী

করে। সমসাময়িক কালের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব যাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তিনি হলেন পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু; ব্যাপকভাবে সাঁওতালি-ভাষাভাষী মানুষের হৃদয়ে আসনলাভে সমর্থ হয়েছেন। অলচিকি লিপির স্রষ্টা হলেন তিনি। মূলত সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে তিনি "আদিবাসী সাঁওতা সেচেদ লাগচার সেমলেদ্" (আদিবাসী সমাজ শিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সংস্থা) নামে এক সংস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর রচিত "দাডেগে ধন" (শক্তিই সম্পদ) "বিদু চাঁন্দান", "ঘেরওয়াল বীর" প্রভৃতি পুস্তকগুলি এই ভাষা-সাহিত্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বর্তমান শতাব্দীর ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বুকেও বাঙলা হরফের মধ্য দিয়ে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলন অব্যাহত থাকে। ১৯৭৮ সালে আকাশবাণীর সর্বভারতীয় নাটক-প্রতিযোগিতায় সাঁওতালি নাটক "টুণ্ডয়ার" (অনাথ)[২] শীর্ষস্থান অধিকার করলে ভারতীয় স্তরে এই ভাষার স্থান নির্ণীত হয়। নাট্যকার ছিলেন সমীর মুর্মু। সহায়-সম্বলহীন এক কিশোর যেভাবে সমস্ত রকম প্রতি-কূল পরিবেশের মধ্যেও বাঁচার জন্য আপোসহীন সংগ্রাম করেছে তার প্রতিচ্ছবিই নাটকটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সাফল্যের কারণে এদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি হয়।

এদেশের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক এখনও সাঁওতালদের সম্পর্কে গড়ে ওঠা স্টিরিওটাইপ[৩] মানসিকতা নিয়ে এদেরকে রুশোর প্রকৃতিরাজ্যের সন্তানরূপেই চিত্রিত করেন এবং রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টিতে এক ধরনের বাণিজ্যিক উপাদান হিসেবেই এদের গ্রহণ করেন। এই সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে আজ থেকে সেই দুই-তিনশত বৎসর পূর্বেকার যে সাঁওতাল সমাজ ছিল তা বর্তমানেও অনড় অটুট থেকে গেছে। রোমান্টিকতায় গা ভাসিয়ে এঁরা এমনই বিভোর হয়ে পড়েন যে পরিবর্তনের স্রোত-টুকুও ভুলে যান। কিন্তু মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসগত ক্রমবিকাশজনিত পরিবর্তনটিকে অস্বীকার করা যায় না। তাই সাঁওতাল সমাজেও পরিবর্তনের দিকগুলি সূচিত হচ্ছে। তবে সভ্যতার মাপকাঠিতে এই পরিবর্তনের মাত্রা বিচার-বিবেচ্য।

মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক মূলধনভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সম্পর্ক প্রথম দিকে ছিল পরস্পরবিরোধী। নিদেন পক্ষে যাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সমস্ত ঘটনাই যে দৈবনির্ভর ছিল এমন কথা যাঁরা অস্বীকার করেছেন তাঁরাই আধুনিক ইওরোপে হিউম্যানিস্ট বা এলিটরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে মুষ্টিমেয় ধূর্ত মানুষের মধ্যে শিক্ষা কুক্ষিগত থাকায় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই প্রতারিত হত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংস্রবহীন গ্রীক-লাটিনের মতো দাঁত-ভাঙা শব্দের সাহায্যে যে ভাষা- ও সাহিত্য-চর্চা অব্যাহত ছিল তাকে বর্জন করে এইসকল এলিটরা নিজস্ব মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ভারতের ক্ষেত্রেও একই রকম চিত্র দেখতে পাই। সাঁওতাল সমাজে এই 'এলিট' শব্দটিকে প্রয়োগ করার ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তি দেখা দিতে পারে। তা সত্ত্বেও শ্রেণীগত অবস্থানে সাঁওতাল বুদ্ধিজীবীদের এলিট বলাই যুক্তিযুক্ত। এঁদের মধ্যে সিংহভাগই গ্রামেগঞ্জে ধনী চাষির ভূমিকা পালন করেন। শুধু তাই নয়, এঁদের কৃষকসত্তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আধুনিক শিক্ষার দৌলতে আমলাতন্ত্রের স্বাদটুকু নিয়ে পুঁজিবাদী রুচি-ফ্যাশনকেও তুলে ধরছেন এঁরা। উগ্রজাতীয়তাবাদ (ultranationalism) এঁদের একটা মস্ত বড়ো হাতিয়ার, যে হাতিয়ারের বলে এই সমাজের প্রত্যেক দিকটাকেই গর্বের সাথে শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করছেন এবং খেটেখাওয়া মানুষের কাছে প্রচার করছেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জীবন ও জীবিকার জন্য নিরলস সংগ্রামই খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনদর্শন। বস্তুত অধিকসংখ্যক সাঁওতাল

এইভাবে দিনগুজরান করে। অথচ সাঁওতাল সমাজের স্বকীয় জাতবিন্যাস ও ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে এঁরা ফায়দা তোলেন। শ্রমকে ভাড়া দিয়েও যাদের বাঁচার কোনো নিশ্চয়তা থাকছে না তাদের ক্ষেত্রে সাহিত্য ব্যাপারটা 'পূর্ণিমা রাত যেন ঝলসানো রুটি'। তাই বলে কি সাঁওতালি সাহিত্য বিকাশের প্রাসঙ্গিকতাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? অবশ্যই না। সংক্ষেপে বলতে হয়, নবোদ্ভূত এলিটরাই সাহিত্য-বিকাশের পথকে ত্বরান্বিত করবেন। কিন্তু বর্তমানে এঁদের ভূমিকা অনেকটা পলায়নমুখী। অধিকাংশরাই সরকারি চাকুরির সূত্রে অর্থ উপার্জন করে জমিতে বিনিয়োগ করেন। ফলে জমির উপর যে গোষ্ঠীস্বত্ব (tribal ownership) এই সমাজের ছিল তা ক্রমে শিথিল হয়ে ব্যক্তিস্বত্বে (individual ownership) পরিণত হয়ে পড়েছে। মুঘল আমলে যারা খাঁটি খুদকাস্ত[৪] কৃষক হিসেবে পরিচিত ছিল এখন তাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর্থিক বিচারে অনেকটা স্বাবলম্বী এই এলিট সম্প্রদায় গরু, হাল, বীজ ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী হলেও নিজ হাতে জমিতে চাষ করেন না। এদিকে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য থাকায় এঁরা সম্প্রদায়গত চেতনাকে (community feeling) কাজে লাগিয়ে নিরক্ষর সাঁওতালদেরই জমি চাষে নিযুক্ত করেন। সরকারি বিধিবদ্ধ মজুরি দিতেও এঁরা প্রস্তুত নন।

সাঁওতাল সমাজের প্রচলিত শাসনব্যবস্থা 'মাঝি' প্রথার ক্ষুদ্রতম ইউনিট 'আতুমাঝি' যেখানে 'মাঝি' (গ্রামের প্রধান), 'জগমাঝি' (তথ্য ও সংস্কৃতির প্রধান হোতা), 'পারানিক' (সহকারী গ্রামপ্রধান), 'গড়ে' (সংবাদ-বাহক), 'নায়কে' (পুরোহিত) প্রমুখ ব্যক্তিগণই প্রত্যেক গ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করেন। গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার উচ্চস্তর দুটি হল দেশমাঝি ও পারগানা প্রথা। সাধারণত গ্রামের প্রভাবশালী ধনী চাষিরাই এই প্রথার বিভিন্ন পদগুলিকে দখল করে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কোন প্রশ্ন নেই। একে একটি প্রতিক্রিয়াশীল নিপীড়ন যন্ত্র বলাই ঠিক। এতে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব চাষি ও ভূমিহীন চাষি সংখ্যালঘিষ্ঠের আজ্ঞাবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলিট পরিবার থেকে আগত অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে (যদিও বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে যৎসামান্য)। আবার এই এলিটরা ধনী চাষিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্মরণীয় যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে কবর দিয়েই মানুষের পদক্ষেপ ঘটেছে আধুনিক সমাজব্যবস্থায়। ইওরোপের এলিটরা নিজ দেশের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় প্রবেশ করেন। এই দেশে জমিতে শ্রেণীগত অবস্থানকে ভিত্তি করেই উনবিংশ শতাব্দীর এলিট সম্প্রদায়রা বাঙলার বুকে তথাকথিত এক নব-জাগরণের[৫] স্রষ্টা হলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা এবং দুর্গত কৃষকের পক্ষ অবলম্বন করে ভূরি-ভূরি প্রবন্ধ কৃষক সমস্যা সম্পর্কে এঁদের সহানুভূতির স্পষ্ট পরিচয় বহন করে[৬]। কিন্তু সাঁওতালি-ভাষাভাষী এলিটরা এদেশীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার খুঁটিকেই শক্ত করতে ব্যস্ত। বিপরীতে আধুনিক জাতিসত্তা গঠনের স্বপ্ন দেখেন।

বর্তমানে উন্নত ভাষাভাষী মানুষেরা সাঁওতালি ভাষাকে অবদমিত করে রেখেছে, সরকারও এই ভাষা বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে—এলিট সম্প্রদায়ের এই বক্তব্যের সারবত্তাকে অস্বীকার না করা গেলেও তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এখনও পর্যন্ত সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে একটি সার্বজনীন হরফ স্বীকৃত হয় নি। বাঙলাভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি-মুসলিম ও বাঙালি-হিন্দুর মধ্যে দ্বন্দ্বের যে ইতিহাস পাওয়া যায় না, রোমক গোষ্ঠী ও অলচিকি গোষ্ঠীর মধ্যে তা পাওয়া যায়। এঁদের ক্ষেত্রে ভাষা অপেক্ষা ধর্মের আকুতিটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৭৯ সালে অলচিকি লিপিকে বামফ্রন্ট সরকার স্বীকার করে নিলেও পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালি ভাষার পূর্বতন অবস্থাই থেকে গেছে। পাঠ্যপুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ভাষায় পঠন-পাঠন সম্ভব নয় বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেন। অপর দিকে সাঁওতাল এলিটরা সরকারের সদিচ্ছার অভাবকেই দায়ী করে থাকেন। বস্তুত, সরকারের ফাইলবন্দী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দেশের সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে সূচিত করে না। বিশেষত বহু জাতি-ধর্ম-ভাষাভাষী এই দেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ যদি ভোটের রাজ্যে সীমাবদ্ধ হয় তাহলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিটাও আদর্শের আকারেই থেকে যায়। ফলে মধ্যযুগীয় সামাজিক সংস্কারে নিমজ্জিত এইসকল এলিট সমাজের মৌলবাদী শক্তির সাথে গাঁটছড়া হওয়ায় তাদের শ্রেণীগত অবস্থানকে সুরক্ষার তাগিদেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রসারের চেষ্টা চালানো ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। অন্যদিকে ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপের যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়েছিল তার নেতৃস্থানীয় এলিটদের সামন্তবাদবিরোধী একটি প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে সাঁওতালভাষাভাষী এলিটরা এখনও পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে টিকে থাকা সামন্ততন্ত্রবাদকে উচ্ছেদের কোনো কর্মসূচীই গ্রহণ করেন নি। তাই সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য আন্দোলন শহরগুলিতেই সীমাবদ্ধ।

তথ্যসংকেত :

১. বীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড)। পৃ ৪

২. কলকাতা ৭ মার্চ ১৯৭৯ : তপশীলি জাতি ও আদিবাসী বিভাগ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩. Sourindranath Sarkar : Psych-Dynamics of Tribal Behaviour (Bookland Private Ltd. Calcutta)

৪. ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য : রাজারামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। পৃ ৩২

৫. অশোক চট্টোপাধ্যায় : প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজ। পৃ ৯২

৬. নরহরি কবিরাজ : উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক। পৃ ২৫৯ (কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি কলকাতা)

রোগের চিকিৎসায় শরীর মন ও তার পরিবেশের আন্তঃসম্পর্কের গুরুত্ব নিয়ে কিছু কথা

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

নিত্য-নতুন ওষুধের আবিষ্কার আর রোগচিকিৎসায় আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রচার এবং প্রসার যে মাত্রা লাভ করেছে তাতে আমাদের অনেকেরই মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, শরীরের যে-কোনো ব্যাধির দাওয়াই বোধ হয় আমরা চলতি পথে এভাবেই অতি দ্রুত হস্তগত করব, যদিও বহুক্ষেত্রে বর্তমান চিকিৎসাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে আমাদের জীবনে।

বহু ধারার চিকিৎসাব্যবস্থা তো চালু রয়েছে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে। তবে কেন আবার সুসহত-সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসার কথা বলা? আসলে, জীবন, প্রকৃতি—এসব নিয়ে গভীরভাবে অনুশীলন করতে গিয়ে মানুষ দেখছে শরীর, রোগ ও চিকিৎসা নিয়ে চলতি ভাবনা আর কার্যপদ্ধতি কতটা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ এবং যান্ত্রিক। কেননা, চলতি চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলি মানুষকে বিশেষ-বুদ্ধিযুক্ত প্রাণী এবং প্রকৃতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও দৈনন্দিন চর্চার মধ্যে প্রকৃতির সাথে শরীর আর মনের গতিময় ছান্দিক সম্পর্ক এবং রোগের উৎস ও তার নিরাময়ে শরীর আর মনের গভীর সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয় না। গুরুত্ব দেয় না পরিবেশের (সামাজিক, পারিবারিক ও প্রাকৃতিক) অবস্থাকে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যদর্শন নিয়ে দু-চার কথা বলা দরকার—চলতি চিন্তা-ভাবনার অসম্পূর্ণতা কোথায় তা বোঝার জন্য।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগনির্ণয়ের জন্য নানা ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে যার মাধ্যমে শরীরের যে-কোনো অংশকে নানাভাবে ভেঙে একেবারে তার মৌলিক গঠন পর্যন্ত অনুধাবন করা যায়। এবং, এই ক্ষমতার জন্য আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান যথেষ্ট গর্ববোধও করে, আর সেই সাথে জনসমক্ষে চেপে যায় মানব-শরীর ও-রোগের উৎসকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা এবং তার কারণগুলিকে। কেননা তা না হলে কর্তৃত্ব, অবদমন ও মুনাফা-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থার ভিত নড়ে উঠবে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ হয়ে পদার্থবিজ্ঞানী হাইজেনবার্গের বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা উক্তি মনে পড়ে যায়। হাইজেনবার্গের ভাষায়, 'কোনো শব্দ বা ধারণা, ততটাই পরিষ্কার যতটা তা হতে পারে, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা খুবই সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ কখনোই বাস্তবের পূর্ণ বিবরণ দিতে পারে না, সর্বদাই বাস্তব প্রকৃতির মোটামুটি একটা ধারণা দেয়, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকরা আসলে একেবারে সত্যকে মেলে ধরতে পারে না কারণ তারা বাস্তবের সীমাবদ্ধ এবং মোটামুটি একটা বিবরণ নিয়ে নাড়াচাড়া করে।'

আসলে বাস্তব চর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষ জানতে পারছে যে, শরীরকে তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে ভেঙে দেখার মধ্য দিয়ে শরীর সম্বন্ধে মন্তব্য করার যে পদ্ধতি, তা অত্যন্ত খণ্ডিত ভাবনার দ্বারা পরিচালিত। তাই, শরীর আর তার রোগের উৎসকে ভালো করে

জানতে হলে দেহকে তার ছান্দিক-গতিময়তার মধ্যেই বুঝতে হবে বেশি মাত্রায় এবং রোগের চিকিৎসায় শরীর, মন ও তার পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ককে দিতে হবে গুরুত্ব। এবং, চিকিৎসকদের চলতি ব্যবস্থার ডাক্তারবাবুদের মতো নির্দেশকের অবস্থানে থাকলে হবে না। তাঁদের আরো গভীরভাবে সমস্যার সাথে যুক্ত হতে হবে যার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক আর অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যক্তি, পরিবার আর চিকিৎসক—সবাই মিলে শামিল হতে পারে। এই পদ্ধতি গড়ে তুলতে হলে চিকিৎসককে ছাড়তে হবে তাঁর সামাজিক কর্তৃত্বের অবস্থান, নতুবা রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রকৃত অর্থে শামিল হওয়া অসম্ভব। কেননা কর্তৃত্বের অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি করে অসুস্থ ব্যক্তি আর চিকিৎসকের মধ্যে অস্বাভাবিক মানসিক দূরত্ব, তৈরি হয় অবদমনের পরিবেশ। তাই রোগচিকিৎসায় সমাজে চিকিৎসকের অবস্থান হবে মানব- তথা জীবন-শিল্পীর। তিনি তাঁর শৈল্পিক বোধ নিয়ে গড়ে তুলতে ব্রতী হবেন সুস্থ মানবিক পরিবেশ ও শৈল্পিক চিকিৎসাবিদ্যা, যার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক খুঁজে পাবেন তাঁর নতুন সামাজিক অবস্থান। বিকশিত হবে তাঁর মানবিক সত্তা, সঙ্গে-সঙ্গে বিকশিত হতে সাহায্য করবেন আরো বহু মানুষকে। গড়ে উঠবে নতুন জীবনের প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যবিকাশসাধনা তথা আন্দোলন।

রোগ কেন হয়?

রোগ কেন হয়? একই পরিবেশে নানান মানুষ একই রোগে আক্রান্ত না হয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয় কেন? রোগের সাথে শারীরিক আর মানসিক গঠনের কী সম্পর্ক? শরীর সুস্থ রাখার জন্য কেন প্রয়োজন সুস্থ পারিবারিক তথা সামাজিক পরিমণ্ডল? এরকম আরো বহু প্রশ্ন উঁকি মারে আমাদের মনের আনাচে-কানাচে। এবং এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য বহু মানুষ চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী সামাজিক পরিমণ্ডলে যে-সমস্ত চর্চা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যায়, তাকেই করা হয় অবদমিত। প্রচার আর আপাত জৌলুসের আড়ালে মানবমনও মানবশরীরের প্রাকৃতিক সত্য উদ্ঘাটনের সামান্য প্রয়াস আর তথ্য চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সত্যকে চাপা দেওয়া বোধ হয় অসম্ভব। কেননা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এত কর্তৃত্ব, ক্ষমতা আর প্রচারের পাশেও ক্ষীণভাবে হলেও টিকে আছে, আবার কোথাও বা বিকশিত হতে চেষ্টা করছে কিছু মানবমুখী প্রাকৃতিক চিকিৎসার ধারা—যেমন, আয়ুর্বেদ, চীনের ঐতিহ্য-বাহী প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি (আকুপাংচার, মক্সি-বসান, গাছ-গাছড়ার চিকিৎসা), যোগ ইত্যাদি। গড়ে উঠছে নতুন চিন্তার আলোয় ইকোলজি চিকিৎসাকেন্দ্র; জাপানে হাজার-হাজার চিকিৎসক (কানপো) পাশ্চাত্য আধুনিক চিকিৎসার সাথে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী চীনা চিকিৎসাপদ্ধতির সমন্বয় সাধন করছেন। দেখা যাচ্ছে, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষিত চিকিৎসককে সুসংহত চিকিৎসার কথা বলতে, অ্যালোপ্যাথকে হোমিওপ্যাথি-আকু-পাংচার চিকিৎসা করতে। তাঁরা বলছেন, যোগাসনের উপকারিতা সম্বন্ধে। এগুলি নিশ্চয়ই আশার দিক। কিন্তু খণ্ডিত এবং কর্তৃত্ববাদী চিকিৎসাপদ্ধতির বদলে সুসংহত চিকিৎসা গড়ে তোলার জন্য শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে যে আরও বেশি মাত্রায় সর্বাঙ্গীণ করে তুলতে হবে তা ভুলে গেলে চলবে না।

সত্যকার স্বাস্থ্যদর্শন

আসলে স্বাস্থ্য হল একটি বহুমুখী অভিব্যক্তি যা নির্ভর করে পরস্পর-নির্ভরশীল শারীরিক, মানসিক, সামাজিক-পারিবারিক এবং প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর। তাই, রোগ এবং শরীর সম্বন্ধে চলতি চর্চায়

স্বাস্থ্য আর রোগকে একটি সরল রেখার দুটি যে প্রান্তদেশ বলে ভাবা হয় তা বোধ হয় ভুল। অনেক সময়ই দেখা যায়, শারীরিক অসুস্থতাকে অতিক্রম করা যাচ্ছে মানসিক এবং সামাজিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে। আবার অনেক সময় শারীরিকভাবে সুস্থ থেকেও কোনো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে মানসিক সমস্যায় বা সামাজিক একাকিত্ব বা বিচ্ছিন্নতায়। এইভাবেই স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক একে অপরের উপর যে নির্ভরশীল তা বোঝা যায়। যখন কোনো মানুষ নিজেকে যথেষ্ট সুস্থ বলে অনুভব করে তখন বলা যেতে পারে, স্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং শরীর এখন বেশ সুসংহত।

শরীর আর মনের বহুমুখী চর্চার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, মানবশরীর একটি স্বনিয়ন্ত্রিত অনন্য ব্যবস্থা যার রয়েছে যথেষ্ট মাত্রার স্থিতিশীলতা। এবং এই স্থিতিশীলতা যেমন সর্বদাই গতিময় তেমনি ছান্দিক। বহু ধরনের পরস্পর-নির্ভরশীল বিষয়ের ওঠা-নামা এই গতিময়তাকে করে তুলেছে ছান্দিক। তাই এই জৈবিক ছন্দের পতন হতে পারে সুস্থতা বা শারীরিক ভারসাম্যের অন্তরায়। আসলে, শারীরিক সুস্থতার অন্য প্রয়োজন বহুমাত্রিক নমনীয়তার। নমনীয়তার মাত্রা যত বেশি হবে ততই কোনো মানুষ অস্তিত্বের দিক থেকে স্থায়িত্ব লাভ করবে। এই নমনীয়তা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত বা অর্থনৈতিক—যাই হোক না কেন, তা প্রয়োজন পরিবর্তনশীল পরিবেশে আরো ভালোভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। নমনীয়তা হারানো মানেই স্বাস্থ্যের মৃত্যু। অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য হল একটা শারীরিক তথা মানসিক ভারসাম্যযুক্ত অবস্থা।

আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য

দার্শনিক দিক থেকে স্বাস্থ্যের এই গতিময় সাম্যের ধারণা মিলে যায় বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাবিদ্যার সাথে। ১. যেমন, হিপোক্রেটিক চিকিৎসার ঐতিহ্য এবং ওয়িয়েনটাল যা পূর্ব এশিয়ার চিকিৎসাবিদ্যার ঐতিহ্য। কেননা, এইসব ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসার ধারাসমূহ শরীরে গতিময় ভারসাম্যের ধারণাকে গ্রহণ করেছে এইভাবে যে প্রত্যেক জীবনের মধ্যে নিজেকে সুস্থ রাখার বা করে তোলার ক্ষমতা বা প্রবণতা বর্তমান। অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থ অসহায় ফিরে আসার জন্য শরীর বজায় রাখে সু-নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ব্যবস্থা, যেমন—হোমিওস্ট্যাসিস, অ্যাডাপ্টেশন (পরিবর্তিত পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা), পুনর্নবীকরণ-পদ্ধতি এবং রিজেনারেশনের পদ্ধতি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনে শরীর যেসব ছোটোখাটো অসুস্থতার মুখোমুখি হয় তা সে নিজ ক্ষমতাতেই সারিয়ে নেয়। অন্যদিকে, কোনো জীব আবার নিজেকে অনেকটা পরিবর্তিত করতেও পারে যদিও সেই পথে তাকে বিভিন্ন দশা—যেমন সংকটকাল এবং মধ্যাবস্থা প্রভৃতি—পেরোতে হয়, এবং শেষে একটি নতুন ধরনের ভারসাম্যের মধ্যে সে হাজির হয়। কোনো মানুষের জীবনধারার পরিবর্তন হয়তো প্রভাবিত হয়েছে কোনো রোগের মাধ্যমে; এই পরিবর্তন হচ্ছে শরীরের সৃজনশীলতার পরিচায়ক যা সে রোগের চ্যালেঞ্জের আগে কোনোদিন উপভোগ করে নি এবং এই ঘটনা প্রমাণ করে যে অসুস্থ শারীরিক অবস্থা প্রাকৃতিক দিক থেকে একটি স্বাভাবিক ঘটনা এবং শরীরের সাথে প্রকৃতির আন্তঃক্রিয়ার নির্দিষ্ট পর্যায়-বিশেষ। তার মানে, শরীর গতিময় সাম্যের অবস্থানে থাকার জন্য সাময়িকভাবে অসুস্থতার মধ্য দিয়ে নিজেকে বুঝতে শেখে এবং প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠার পথকে চেনে।

শারীরিক ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতার ব্যাখ্যায় পীড়নের (মানসিক ও শারীরিক) ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসলে পীড়িত অবস্থা হল শরীরের ভার-সাম্যহীন অবস্থা, পরিবেশের প্রভাবের দরুন। সাময়িক পীড়ন স্বাস্থ্যের একটি সাধারণ দিক এবং

শারীরিক নমনীয়তাকে সাময়িকভাবে নষ্ট করে। কিন্তু দীর্ঘায়িত পীড়ন সাধারণভাবে ক্ষতিকারক এবং বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি করে। পীড়নের সাথে অসুস্থতার সংযোগের চাবিকাঠিটা কী তা আজও ঠিকভাবে জানা যায় নি। তবু এটা বলা যায়, দীর্ঘস্থায়ী পীড়ন শরীরের প্রতিরোধক্ষমতাকে অবদমিত করে। তাই, রোগের সৃষ্টিতে পীড়নের ভূমিকা যখন থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব পাবে তখন থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় এক নতুন গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা সংযোজিত হবে।

রোগের উৎপত্তিতে পীড়নের ভূমিকার স্বীকৃতিতে রোগও যে "সমস্যা সমাধানের উপায়" হতে পারে—এই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা জন্মলাভ করেছে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কনডিশানিং-এর জন্য অনেক সময় মানসিক পীড়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তখন মানুষ "সচেতন বা অবচেতন ভাবে" পীড়ামুক্তির পথ হিসেবে বেছে নেয় অসুখকে। তখন তাদের অসুখ হতে পারে শারীরিক, অথবা মানসিক। হয়তো বা তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে ভায়োলেনট এবং অস্থির মানসিকতার মধ্যে দিয়ে যা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধ। নেশার ওষুধ খাওয়া, আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা এবং যেগুলিকে আবার সামাজিক ব্যাধি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

হিপোক্রেটিক চিকিৎসাবিদ্যার উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় এবং এই ঐতিহ্যপূর্ণ চিকিৎসাবিদ্যার "বাতাস, জল এবং স্থান" নামক একটি গ্রন্থ বর্তমানে মানবপরিবেশবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবেও স্বীকৃতি পেতে পারে। কারণ, এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে বাতাস, জল এবং খাবারের গুণাগুণ, বাসস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জীবনচর্চার সাধারণ রীতিনীতি কিভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। এই-সমস্ত বিষয়ের হঠাৎ কোনো পরিবর্তন রোগসৃষ্টির ক্ষেত্রে কী রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে সে বিষয় এই বইয়ে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। শরীরের ওপর পরিবেশের প্রভাব কী, তা জানা-বোঝাকে চিকিৎসকের দক্ষতার প্রাথমিক বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছে এতে। কিন্তু যান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার বিকাশের সাথে-সাথে হিপো-ক্রেটিক চিকিৎসাবিদ্যার এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অবহেলিত হল।

রোগের চিকিৎসায় হিপোক্রেটিক চিকিৎসাবিদ্যা স্বীকৃতি দিয়েছিল শরীরের নিজস্ব রোগপ্রতিরোধ ও সারানোর ক্ষমতাকে। এবং চিকিৎসকদের দায়িত্ব হল—শরীর যাতে তার এই স্বাভাবিক ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারে তার জন্য সহযোগিতা করা।

প্রাচীন চীনের চিকিৎসাদর্শন

চীনা চিকিৎসার মূল কথাই হচ্ছে রোগের সৃষ্টি শরীরের 'ভারসাম্যহীনতা' থেকে এবং এই অবস্থার সৃষ্টি হয় বাজে খাবার, ঘুমের অভাব ও ব্যায়ামের অভাবে বা পরিবারের সাথে উপযুক্ত ঐক্য বা সুসম্পর্কের অভাবে। প্রাকৃতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে ঋতুপরিবর্তনকে এতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। চীনাদের ধারণায়, রোগ কোনো বাইরের আক্রমণ নয় বরং শারীরিক ভারসাম্যের পতন, যা আবার শরীর তার স্থিতিশীল প্রবণতার জন্য কাটিয়েও উঠতে পারে। সেইজন্য স্বাস্থ্য এবং রোগের মধ্যে চীনারা কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানেনি। বরং ভেবেছে, এ দুটিই শারীরিক গতিময় স্থিতিশীলতার বিভিন্ন স্বাভাবিক দশা (ফেজ)।

চীনা চিকিৎসাবিদ্যার ধারণাকে সুসংহত তথা সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করতে হলে আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে চীনা চিকিৎসাবিদ্যার ধারণা কতটা সর্বাঙ্গীণ এবং আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশে তার কতটা গ্রহণ করা যায়। চিকিৎসার সর্বাঙ্গীণতা সম্বন্ধে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা মানুষের শরীরকে মনে করে পরস্পর-যোগাযোগ ও সম্পর্ক যুক্ত শুধু একটি জীবন্ত দেহ। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসার উদার তথা গভীর ধারণা হল মানবশরীরের যে সংগঠন বা ব্যবস্থা, তা আরো বৃহত্তর প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ চীনা চিকিৎসাব্যবস্থা প্রথম ধারণাতে নিশ্চয়ই সর্বাঙ্গীণ।

সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসার প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়া উচিত রোগীকে যতটা সম্ভব সচেতন করা তার শরীরের ভারসাম্যহীনতার ধরন এবং মাত্রা সম্বন্ধে। তার মানে, তার সমস্যাকে উৎসের বৃহত্তম ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত করা এবং তার ফলে রোগের বিভিন্ন দিক সমূহের আন্তরিক সমীক্ষায় রোগী এবং ডাক্তার উভয়েই শামিল হতে পারবে। এইভাবে রোগচিকিৎসায় এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলে—যে-সমস্ত পরস্পরসম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থা বা সংগঠনের চিত্র ফুটে উঠবে, যা রোগের উৎসের জন্য দায়ী, তা চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা নেবে, কারণ তা রোগীর দুশ্চিন্তা কাটাবে এবং তাকে আশার আলো দেখাবে, তার আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলবে। আর এর ফলে শরীরের নিজস্ব রোগ সারানোর ক্ষমতা আরও কার্যকর হয়ে উঠবে।

ক্যান্সার প্রসঙ্গে

সুসংহত তথা সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে কথা বলা শেষ করার আগে ক্যান্সার চিকিৎসায় একটা নতুন পথের কথা উল্লেখ করছি, যা সিমনটোন পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। এই চিকিৎসাপদ্ধতি চর্চা করার ক্ষেত্রে কার্ল সিমনটোন (ক্যান্সার চিকিৎসক) এবং স্টিফেনি ম্যাথিউস-সিমনটোনের (মনোরোগ-চিকিৎসক) নাম উল্লেখ করতে হয়।

ক্যান্সার এমন একটা রোগ যা বর্তমান সভ্যতার ভারসাম্যহীনতার বহু বিষয়কেই যেন তুলে ধরে। ভারসাম্যহীনতা এবং খণ্ডিত চিন্তা-ভাবনা যা বর্তমান সভ্যতা-সংস্কৃতির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে, তা ক্যান্সার সৃষ্টিতে বোধ হয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে, অন্তত দুই সিমনটোনের ধারণা তেমনই। তাঁদের চিকিৎসার অধীনে যে-সমস্ত ক্যান্সার রোগী আছে তাদের আয়ু প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে অন্যান্য সবচাইতে উন্নত-মানের ক্যান্সার চিকি ৎসালয়ের চাইতে। তাছাড়া ওই-সমস্ত অসুস্থ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনমান এবং কাজের ক্ষমতা এককথায় বলা যেতে পারে অসাধারণ।

ক্যান্সার সম্পর্কে আমরা সকলে যেভাবে পরিচিত তা গড়ে উঠেছে আমাদের সংস্কৃতির খণ্ডিত বিশ্বদৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে এবং যা প্রভাবিত হয়েছে প্রযুক্তিমুখী চিকিৎসাচর্চার দ্বারা। ক্যান্সার যেন শরীরের খুব শক্তিশালী এক বহিঃশত্রু এবং একে প্রতিরোধ করার কোনো আশাই যেন নেই। সেইজন্য ক্যান্সার আর মৃত্যু যেন সমার্থক দুটি শব্দ। ক্যান্সারের চিকিৎসা তা রেডিয়েশন (একস্‌রে, গামা রে, ফাস্ট নিউট্রন ইত্যাদি), ওষধি-চিকিৎসা (কেমোথেরাপি), শল্য-চিকিৎসা বা এগুলির সমন্বয়ে যাই হোক্ না কেন তা যথেষ্ট জোরালো, নেতিবাচক, এবং শরীরকে আরো বেশি মাত্রায় আহত করে। চিকিৎসকরা ক্রমশই এটা দেখছেন যে, ক্যান্সার ওই শারীরিক ব্যবস্থারই গণ্ডগোল এবং পুরো শারীরিক ব্যবস্থাকেই এতে শামিল করে। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তিরা তাদের ক্যান্সারকে শরীরের নির্দিষ্ট এলাকার সমস্যা বলে ভাবে, অন্তত রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে। এবং যত শীঘ্র সম্ভব এই সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে একে একেবারে ভুলে যেতে চায়। বেশির-ভাগ ব্যক্তির মানসিক গঠন এমন পর্যায়ে থাকে যে তারা রোগসৃষ্টির বিষয়টিকে বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে দেখতে চায় না এবং রোগসৃষ্টির প্রতিটি বিষয়ে মন আর শরীরের পরস্পর-নির্ভরশীলতাকে বুঝতে চায় না। ফলে বহু ক্যান্সার রোগীর কাছে নিজের শরীরটাই শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং শরীরের প্রতি সামান্য আস্থা পর্যন্ত তারা রাখতে পারে না ; কার্যত, নিজের শরীর থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন বোধ করে।

সিমনটোন চিকিৎসাপদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তা ক্যান্সার সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণা তথা মানসিকতাকে উলটে দিতে চায়। বর্তমানে কোষজীববিদ্যা (সেলুলার বায়োলজি) দেখাচ্ছে যে, ক্যান্সার কোষসমূহ যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, বরং দুর্বল এবং এলোমেলো বিশৃঙ্খল। তারা আক্রমণ করে না বা ঢুকে পড়ে না বা ধ্বংস করে না। আসলে সংখ্যায় ক্রমশই বেড়ে যায়। ক্যান্সার শুরু হয় এমন কোষ দিয়ে যার জেনেটিক গঠনে গণ্ডগোল আছে, কারণ এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোনো বিষাক্ত পদার্থ নিয়ে বা পরিবেশের কোনো প্রভাবে কিংবা কোনো কারণে জীব নিজেই ওই জেনেটিক-ত্রুটিযুক্ত কোষ উৎপাদন করে ফেলেছে।

সিমনটোন পদ্ধতিতে ক্যান্সার সম্পর্কে একটি জৈব-মানসিক (সাইকোসোমাটিক) মডেলের কথা ভাবা হয়েছে, যা দেখায় মন এবং শরীর উভয়ে একসাথে কিভাবে ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। যদিও এ বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু, এটা দেখা গেছে আবেগজনিত পীড়নের (ইমোশনাল স্ট্রেস) দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে শরীরে এ ব্যাপারে। এক, এটি শরীরে প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে অবদমিত করে; এবং দুই, সেই সাথে হর্মোনের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়। ফলে, ত্রুটিযুক্ত কোষের উৎপাদন বাড়ে। তাই দুই সিমনটোনের ধারণায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে ব্যক্তির মানসিক আবেগের স্তর বা ধরন ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লরেন্স সি-সান্ নামে একজন গবেষক প্রায় পাঁচশত ক্যান্সার রোগীর জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখেছেন যে একাকিত্ববোধ, অবহেলিত হওয়ার মনোভাব এবং যৌবনে হতাশার মনোভাব, সাথে মানবিক সম্পর্কের সমস্যা কিংবা বয়সকালে অত্যন্ত গভীর কোনো সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য একাকিত্ব তাদের বেশির ভাগের মানসিক গঠনে রয়েছে।

সিমনটোন চিকিৎসাদর্শন বলে যে ক্যান্সার আসলে ব্যক্তির একটি সামগ্রিক সমস্যা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করে শরীরে প্রতিরোধক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার দিকে। এই ক্ষেত্রে জোর দেয় শরীরকে শিথিল করার তথা তার কঠোরতা লাঘবের উপর (রিল্যাক্সেশন)। কারণ কোনো মানুষ যখন পুরোপুরি রিল্যাক্সড্ হয় তখন তার অবচেতনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় এবং তার মানসিক গঠনের অনেক অজানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যেগুলি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান। দুই সিমনটোন এই রিল্যাক্সেশন অভ্যাস করানোর আগে রোগসৃষ্টির ৬ থেকে ১৮ মাস পূর্বে তার (রোগীর) আবেগজনিত সমস্যার বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করে বুঝতে চায় এবং সে ব্যাপারে রোগীর যদি কোনো পাপবোধ থাকে তাহলে সেই বোধকে উলটে দিতে বা পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়।

সিমনটোনেরা তাঁদের চর্চায় ক্যান্সার সৃষ্টিতে পরিবেশীয় প্রভাব ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের উপর গুরুত্ব দিলেও, এই কথা মূলত তাঁদের চর্চার মধ্যে স্থান পেয়েছে যে, শুধু বিষাক্ত রাসায়নিক বা বিকিরণ (রেডিয়েশন) বা জেনেটিক ত্রুটি ক্যান্সার সৃষ্টির পূর্ণ বা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেয় না।

সুসংহত তথা সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসা গড়ে তোলা নিয়ে কিছু কথা বলার শেষে এখন এ কথা বলা যেতে পারে যে, স্বাস্থ্যসমস্যাকে বুঝতে এবং চিকিৎসা করতে হলে ব্যক্তির শরীর-মন-সমাজ-পরিবেশের আন্তঃ-ক্রিয়াকে ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং সামগ্রিক-ভাবে গোটা ব্যবস্থার মধ্যে গতিময় ভারসাম্য গড়ে তোলার জন্য যুক্ত হতে হবে প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যবিকাশ সাধনা তথা আন্দোলনে, যেখানে চিকিৎসকের ভূমিকা হবে জীবনশিল্পীর। সুসংহত চিকিৎসার আসল কথা

হল, "গড়ে তোলো জীবনের ভারসাম্য", অস্তিত্বের বৃহত্তর প্রাকৃতিক ক্ষেত্রকে মাথায় রেখে। তাই জীবন সম্পর্কে খণ্ডিত যান্ত্রিক ধারণার পরিবর্তে গড়ে উঠুক অস্তিত্বের বৃহত্তর প্রাকৃতিক ধারণা। কেননা জীবনের সমস্যা সমাধানে শুধু খণ্ডিত ধারণা দিয়ে জীবনের সমগ্রতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

তরুণ বিজ্ঞানী জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় "শরীরের উপর বিকিরণের প্রভাব" বিষয়ে সম্প্রতি ডক্টরেট লাভ করেছেন। "ইনডিয়ান রিসার্চ ইনসটিটিউট ফর ইনটিগ্রেটেড মেডিসিন" (ইরিম)-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, এবং এই প্রতিষ্ঠানের অধীন "রণজিৎ স্মৃতি আকুপাংচার কলেজ ও হাসপাতালে"র গবেষণা ও বিকাশ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত। সম্প্রতি-প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ-হাসপাতালটির অবস্থান হাওড়া জেলার আন্দুল-মৌড়ীতে।

গ্রন্থসমালোচনা

গণমুক্তির দিশা-সন্ধানী

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষী আহমদ শরীফ সাহেবের রচনা পাঠের সুযোগ হবার অর্থ শুধু জ্ঞান-ভাণ্ডারের বিস্তারই নয়, চিত্তলোকেরও ঊর্ধ্ব চারণ। তাঁর একুশটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধের সংকলন সমালোচ্য গ্রন্থটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রথম প্রবন্ধটির নামেই গ্রন্থটি পরিচিত এবং এর বক্তব্য সমাজবিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত। জীবজগতের বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে লেখক 'ভয়-ভরসা ও কাঙ্ক্ষাজড়িত চিন্তা ও কায়িক শ্রমে' 'মানব-প্রজাতির আত্মবিকাশের (দৈহিক ও মানসিক) কারণ' আবিষ্কার করেছেন। তারপর আদিমানব ও মানব-সভ্যতার মধ্যযুগের সমীক্ষা করার পর তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসাদে এই পরম সত্য খুঁজে পেয়েছেন: 'অতীত ও ঐতিহ্য মানুষের স্বকালের স্ব-সমাজের কোন সমস্যারই সমাধানে, কোন অভাব পূরণে প্রত্যক্ষে তো নয়ই পরোক্ষেও কোন সহায়তা করে না।·· জীবন বর্তমানে ও ভবিষ্যতে স্থিত, হৃত অতীতে নয়।' মানবসমাজবীক্ষার প্রসঙ্গে স্বভাবতই তাঁকে ধর্মের প্রাকৃত রূপেরও বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। তিনি দেখেছেন যে শাস্ত্র ও আচারনিষ্ঠ ধর্ম বহুজনের স্বীকৃত হলেও উচ্চতর মানবতার প্রতিষ্ঠার জন্য তা অপরিহার্য তো নয়ই, কোথাও কোথাও বাধক। তাঁর সিদ্ধান্ত হল: 'যৌথ জীবনে বাঞ্ছিত বা আদর্শ সমাজ-সদস্যে কাম্যগুণ হচ্ছে সংযমে, সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের মানসিকতা ও যোগ্যতা। শাস্ত্রের আনুগত্যে, ধর্ম-ভাবের অনুশীলনে এ বাঞ্ছিত গুণ অর্জন সম্ভব বলে মনে করেছেন, এখনও করেন একদল, অন্যদল এর সঙ্গে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রকও আবশ্যিক ও বিশেষ কেজো বলে মানেন। যুক্তিবাদী ভিন্ন একদল তীক্ষ্ণ তীব্র গভীর নীতিচেতনা ও নীতিনিষ্ঠাই মানুষকে অহম্‌সচেতন, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, বিবেকবান ধীরবুদ্ধির, স্থিরসংকল্পের মানুষ রূপে তৈরি করে বলে বিশ্বাস করেন। অহং চেতনা, আত্মমর্যাদা-বোধ ও আত্মসংযমই মানুষকে নৈতিকতানিষ্ঠ করে। এ তিন গুণ মূলত মনুষ্যত্ব—অন্যসব সদ্‌গুণ এ তিনটের উপজাত। মানবতা এর শ্রেষ্ঠ প্রসূন।'

মূলত 'সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত' মানুষের 'মনুষ্যত্বের বা মানবতার অভাবের বা অপূর্ণতার' খতিয়ান প্রসঙ্গে লেখকের বিশ্লেষণী দৃষ্টির সন্ধানী আলো তার দুর্বল স্থানে পড়েছে তার ব্যর্থতা বা হতাশার জয়ঘোষের জন্য নয়, তার উত্থানের দিশা-সন্ধানী রূপে। শরীফ সাহেবের ভাষাই উদ্ধৃত করা যাক: '···ব্যক্তিমনে প্রতিবেশীর প্রতি, স্বধর্মীর প্রতি, কাঙালের প্রতি, সর্বোপরি মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় দেশনা একটা হার্দিক সম্পর্ক-বিহীন যান্ত্রিক ও কৃত্রিম আচারে-আচরণে-অনুষ্ঠানে-পালা-পার্বণে-উৎসবে পর্যবসিত হয়েছে। তাই শুক্র-বার ছাড়া ভিক্ষা মেলে না, জাকাত মেলে বছরে এক-দিনে একবারে এবং ফিতরাও তাই। যেন ওই তিন-দিন ছাড়া বছরের আর তিনশ বাষট্টি দিন ওদের ক্ষুধা থাকে না, মা-বাপের মৃত্যুদিনে ছাড়া কারো ঘরে কাঙালের সহজে একমুঠো ভাত জোটে না। এ কি মানবতা-মানবিকতা, না বিবেক-বিবেচনাহীন যান্ত্রিক আচারনিষ্ঠা?' লেখকের অনাবিল যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টি সমাজের অর্ধেক—নারীর উপর স্বভাবতই পড়েছে। তিনি দেখেছেন: 'ভারতে বিশেষ করে বাঙলায় নারী-দেবতার পূজক হয়েও বাঙালী নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয় নি, তাদের কাছেও, বিবাহের মন্ত্রে উঁচু-মানের তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও নারী রতিভোগ্য সন্তান-উৎপাদক যন্ত্রমাত্র। আর মুসলমানেরা শাস্ত্রে নারীর অধিকার ও ঘরে সম্মানিত অবস্থান স্বীকৃত বলে যতই তুষ্টির ও তৃপ্তির বাণী উচ্চারণ করুক না কেন, পুরুষের সন্তোগার্থ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকারের মধ্যেই নারীর ও নারীত্বের চরম অবমাননা প্রকট হয়ে রয়েছে। কাবিন তো দেহসম্ভোগের দাম।' অন্যত্র 'স্বামীবাচক যত শব্দ আছে, সবগুলোই তাই মালিক-মনিব বা পূজ্যজ্ঞাপক।'

এমনি ভাবে মনীষী লেখকের দৃষ্টি আধুনিক রাষ্ট্রের অধিবাসী মানুষের এক স্ববিরোধিতা—মানবতাবিরুদ্ধ আচরণ যুদ্ধবৃত্তির উপরও পড়েছে। তিনি এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা যে-কোনো বিশ্বপথিক মনুর সন্তানেরই জিজ্ঞাসা—'এমন দিন কি মানবতার নামে আসবে না, যেদিন অন্যায় বলেই মানুষ সৈনিক হতে, যুদ্ধ করতে অস্বীকার করবে? ন্যায়বিরোধী অযৌক্তিক অনৈতিক অপকর্ম করার অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কি অমানবিক,—মনুষ্যত্ব-বিরোধী?'

শরীফ সাহেবের সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের অতি উচ্চগ্রামে বাঁধা এই বক্তব্যের উপসংহারও সমান মূল্যবান: 'দেশ, গোষ্ঠী বা জাতিগতভাবে মানবতার বিকাশ ও অভিব্যক্তি না ঘটলে গণমুক্তি তথা সর্বাত্মক মানবমুক্তি ঋজুপথে সম্ভব হবে না কখনো। তাই মানববাদীর উদ্যোগে সংঘটিত বিপ্লবই কেবল গণ-মানবের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে পারে।' প্রবন্ধটি প্রতিটি চিন্তাশীল বঙ্গভাষীর একবার নয়, বার বার পড়া দরকার।

এমন উচ্চকোটির বক্তব্যে ছিদ্রান্বেষণবৃত্তিচালিত হয়ে নয়, কর্তব্যবোধে দুটি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হচ্ছে। এর প্রথমটি ঘটেছে সম্ভবত কাল-ব্যবধানের জন্য। প্রবন্ধটি লেখকের ১৯৮৭ খ্রী গোবিন্দ দেব স্মারক বক্তৃতা। মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীরা (লেখকের পরিভাষা অনুযায়ী মস্তিষ্কাজীব) অনেক দিন যাবৎ জানলেও মার্কসবাদের অনুসারীরা ১৯৮৯ খ্রী ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত লেখকের মতোই বিশ্বাস করতেন যে 'কেবল ডাস্ ক্যাপিটাল পন্থীরাই কালসচেতন' অথবা 'একালে কেবল কমিউনিস্টরাই আদর্শানুগতবশে মানববাদী হয়েছে।' বেজিঙ-এর তিয়েন-আন-মিয়েন স্কোয়ারে ধর্মঘট উপস্থিত ছাত্র-যুবকেরা মার্কসবাদে বিশ্বাসীদের নিশ্ছিদ্র দুর্গের ভিত্তিমূলে যে প্রথম সুড়ঙ্গ খোঁড়ে তারপর ১৯৮৯ খ্রী শেষ হবার পূর্বে পূর্ব ইউরোপ এবং খোদ সোভিয়েত রাশিয়ায় তার পূর্ণাহুতি হয়েছে। মার্কসবাদের অভেদ্য দুর্গ ধসে পড়েছে। (এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে বর্তমানে সোভিয়েত দেশ ও পূর্ব ইউরোপে একদা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি যে পুঁজিবাদী কনজিউমারি-জমের পথ ধরেছে তাই মার্কসবাদের একমাত্র বিকল্প।) কিছু অন্ধ কট্টর মার্কসবাদী অবশ্য এখনও চোখ বুজে সূর্যকে অস্বীকার করার মতো এখনও 'একা কুম্ভ রক্ষা করে / নকল বুঁদিগড়।' তবে শরীফ সাহেবের মতো মুক্তবুদ্ধির মনীষীকে তাঁদের পর্যায়ে ফেলা যায় না। গ্রন্থাকারে বক্তব্যটি প্রকাশের সময়ে (১৯৯০ খ্রী) এই অংশের পরিমার্জন করা সম্ভব হলে উপযুক্ত হত। দ্বিতীয় ত্রুটি 'প্রকৃতি আজ তার (মানুষের) দাস ও বশ' উক্তি। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের পূর্বোক্ত ধারণা বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ থেকে বিজ্ঞানে অস্বীকৃত। বিজ্ঞানের holistic দর্শন এখন প্রমাণ করেছে যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার। পরিবেশবিজ্ঞান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বোক্ত ধ্যান-ধারণার অনুবর্তনের পরিণাম কেবল মনুষ্যেতর জীববৃক্ষলতার জগৎই নয়, অপিচ মনুষ্য-প্রজাতিরও মহতী বিনষ্টির

মানবতা ও গণমুক্তি—আহমদ শরীফ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১১৪ মতিঝিল ক এ, ঢাকা ১০০০। একশ পাঁচ টাকা।

উপক্রমণিকা। তাই প্রকৃতি-মানবের সম্পর্ক সম্বন্ধে পুরাতন বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি অতীব বিপজ্জনক।

এমনি মূল্যবান সমালোচ্য গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধ। উদ্‌বৃত্তি দিতে গেলে সমগ্র গ্রন্থটিই উদ্‌বৃত্ত করতে হয়। তা সম্ভব নয় বলে গ্রন্থটির প্রতি অবিচার করার ঝুঁকি নিয়েও শরীফ সাহেবের চিন্তাভাবনার কিছু মৌক্তিক পাঠকদের উপহার দেবার চেষ্টা করা হবে। 'পরিবেশের চাপে মানুষ দায়ে পড়েই সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতার সহাবস্থানের অঙ্গীকারবদ্ধ হবেই।' (আবর্তিত সমাজের আজকের সঙ্কট)। 'শরিয়া অনুগ জীবন-জীবিকা-সমাজ-রাষ্ট্র রচনা ও পরিচয় কি এযুগে সম্ভব? তাহলে নির্বোধ নিরক্ষরের কেবল ভোট যোগাড়ের জন্যে লোকঠকানো ধর্মধ্বজা কেন? রাজনীতিকদের কি বিবেকবান মানবপ্রেমী লোকসেবী মানুষ হতে নেই?' (যুগান্তলক্ষণ চেতনার রূপান্তর)। '...দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা যতটা তত্ত্বজ্ঞানী ততটা মননশীল নন। দেশকালের পার্থক্যজাত ব্যবধান ও সমস্যা তাঁদের চেতনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় না। তাঁরা উনিশ শতকের য়ুরোপীয় বাস্তব সমাজ ও সমস্যাজাত মননপুষ্ট মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন নির্দেশিত সমস্যাকে ও সমাধানপন্থাকেই চিরসত্য-চিরপ্রযোজ্য 'ওহী'বৎ মান্য করেন' (সংস্কৃতির রূপান্তর প্রসঙ্গে)। '...খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ব্যতীত প্রাণিজগতে ঝগড়া-বিবাদ থাকলেও হত্যার জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে হন্যে হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত বিরল। ...আশৈশব প্রাপ্ত ও লালিত বিশ্বাস-সংস্কার থেকে আত্মমুক্তির আপাত উপলব্ধ উপায় হচ্ছে কেবল সন্দেহের, জিজ্ঞাসার ও যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকের আনুগত্য।' (ভয় ও ভরসা)।

বিশেষ করে গত অক্টোবর থেকে আমরা ভারতে যে দুঃখজনক ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করলাম তার হাত এড়ানোর সূত্র পাওয়া যাবে ভূয়োদর্শী লেখকের নিম্নোদ্ধৃত নিদানে: 'ঈশ্বর সমযুক্ত আচার-আচরণের পালা-পার্বণের সামাজিক লালন ও রূপায়ণই ঘটায় ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কিংবা জাতিগত লড়াই। কাজেই আস্তিক্যটা বজায় রেখে অর্থাৎ স্রষ্টায় বা ঈশ্বরে আস্থা রেখে শাস্ত্রিক আচার-আচরণ-পালা-পার্বণকে ব্যক্তিক বলে মেনে সামাজিকভাবে বর্জন করলেই কেবল বিধর্মী-বিদ্বেষের বিলুপ্তি সম্ভব হবে। ...মানুষের শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ-পালা-পার্বণ হয়েছে কাঙ্ক্ষাপূর্তির প্রায়োগিক দিক। তাই তারা শঙ্কা-সঙ্কট উত্তরণ এবং কাঙ্ক্ষ্য বস্তু প্রাপ্তিলক্ষ্যে আচারসর্বস্ব। আর ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক লড়াই বাধে ওই আচারে অনুষ্ঠানে বাধাদানের আর প্রতিষ্ঠান ভাঙার ফলে। সব মানুষ বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-সমাজতত্ত্বে বাঞ্ছিত মানের বিদ্যা অর্জন করলে এবং বিশ্বাসে আস্তিক হয়েও জ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠ হলে, তখন মনে হয় সমাজে স্বাস্থ্যের জন্যে, সম্প্রদায়গত জীবন নিরুপদ্রব রাখার জন্যে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থান করার অঙ্গীকার সহজেই করতে পারবে। ...আজকের বাঞ্ছিত জিগির বা শ্লোগান হবে—স্রষ্টার অনুগত হোন, শাস্ত্রের নয়।' আর্ষদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীর উপদেশ এই ভারতীয় উপমহাদেশের শতাধিক কোটি নর-নারীর জপমন্ত্র হোক বাঁচার তাগিদে।

আহমদ শরীফ সাহেব শতজীবী হয়ে বঙ্গভাষী তাবৎ গৌড়জনকে তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টির সুধা সরল লেখনীর মাধ্যমে পরিবেশন করুন।

কবিতার দশ দিক

মেঘ মুখোপাধ্যায়

মাত্র সতেরো বছর বয়সে ১৯৪৬ সালে যে কিশোরী কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর "কবিতা" পত্রিকায় সেই রাজলক্ষ্মী দেবী আজ বাঙলা কবিতার জগতে একটি বিশিষ্ট নাম। বর্তমানে মহিলা-কবির সংখ্যা কম নয়। যে কোনো কবিতাপত্রের পাতা ওলটালেই দেখা যায় মহিলারা এখন দাপটে কবিতা লিখছেন। রাজলক্ষ্মী দেবীকে এই দলের অগ্রগণ্য বলা যায়।

বইটিতে মোট পঁয়তাল্লিশটি কবিতা আছে। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রক্ত-অলক্তক' প্রকাশের এক যুগ পর এই বইটি বেরিয়েছে। এই এক যুগে তিনি নিশ্চয় আরো অনেক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু বইয়ের জন্য মাত্র পঁয়তাল্লিশটি নির্বাচন করা থেকে বোঝা যায় তিনি খুঁতখুঁতে। কবিতাগুলি পড়ে তাদের গভীরতা অনুভব করে তার প্রমাণ মেলে। প্রত্যেকটি কবিতাই পাঠকের মনোযোগ দাবি করে, তবুও প্রথমের নাম-কবিতাটিসহ আমার অধিক ভালো লেগেছে এইগুলি—সাদৃশ্য, আর্দ্র, তোমার স্পর্শের চমৎকার, তুমি আছো, দুহিতা, স্বাতন্ত্র্য, যোরানো সিঁড়ি এবং অভ্যাসদোষ। এই কবিতাগুলিতে তাঁর আত্মানুসন্ধানের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি নিজের অস্তিত্বের অর্থ এবং পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূত্র বুঝতে চেয়েছেন—একজন বিশেষ নারী হিসেবে, আবার মানুষ হিসেবে। কবিতার ভাষায়, ভাবে বা উপমায় কোনো চটুলপনা বা ওপরচালাকি নেই, বরং একজন স্থিতপ্রজ্ঞ কবির কলম থেকেই এমন স্তবক উঠে আসতে পারে: 'জলে হাত দিলে ভেঙে যায় প্রতিকৃতি,—সে কি মায়া?/ আয়না, নিভৃত অংশীদার—কেন কেড়ে রাখো ছায়া,/ ভৌতিক মুখোশ প'রে পৃথিবীতে হাঁটি উল্‌টো পায়ে।' (আয়না, নিভৃত অংশীদার) বইটি তিনি 'সন্তান ও সন্তানোপম উত্তরপুরুষদের জন্যে' উৎসর্গ করেছেন।

প্রবীণ কবি আনন্দগোপাল সেনগুপ্তর কবিতাগুলি তাঁর বইটির নামের মতোই একই সঙ্গে সরল ও গভীর। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি কবির সম্বন্ধে আমাদের মন তৈরি করে দেয়। ভালোবাসা, স্নেহ, ভ্রমণ-অনুরাগ, প্রাত্যহিক জীবনের ক্লেশ তাঁর কবিতার বিষয়। সভ্যতার নানা অবক্ষয় দেখে তিনি বিরক্ত। যেমন 'নির্লজ্জ' নামের কবিতার এক জায়গায় লিখেছেন—'ভোগ্যপণ্য যা ব্যবহার করছি/বাবা কেন, বাবার বাবাও স্বপ্নে দেখেন নি।/তবু তৃপ্তি নেই,/তবু মনে হয় এত কম কেন?' ভোগবাদী সমাজকে ধিক্কার দিতে তিনি ছাড়েন নি। তাঁর কবিতা পড়ে মনে হল তিনি ছন্দে, না ছন্দহীন স্পন্দিত গদ্যের চালে কবিতা লিখবেন সেই দ্বন্দ্বে রয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে আরো কাব্যগ্রন্থ পাবার আশা রইল।

"সাইলেন্স টাওয়ারে কিছুক্ষণ" গ্রন্থের প্রথম কবিতা-টিতেই আনন্দ ঘোষ হাজরা পাঠকচিত্ত মাত করে

আয়না, নিভৃত অংশীদার—রাজলক্ষ্মী দেবী। নবার্ক। কলকাতা-৫৯। পনেরো টাকা। **মায়ের মুখ**—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। বিশ্বজ্ঞান। কলকাতা-৯। দশ টাকা। **সাইলেন্স টাওয়ারে কিছুক্ষণ**—আনন্দ ঘোষ হাজরা। বিশ্বজ্ঞান। কলকাতা-৯। দশ টাকা। **ভালোবাসা ভালোবাসা**—জিয়া হায়দার। বট-মিহির প্রকাশনী। ঢাকা। পঁয়ত্রিশ টাকা। **গোপনে হিংসার কথা বলি**—মৃদুল দাশগুপ্ত। প্রতিভাস। কলকাতা-২। দশ টাকা। **শুধু রবির জন্য**—হাসনা বেগম। প্রজ্ঞা। ঢাকা। পঁচিশ টাকা। **ঘুমের জানালা**—শঙ্করজ্যোতি দেব। নবার্ক। কলকাতা-৫৯। বারো টাকা। **অতদূর যেতে পারি না**—সুভাষ দে। প্রমা। কলকাতা-৯। বারো টাকা। **মেঘরঞ্জনী**—সৈয়দ হাসমত জালাল—স্বর্ণাক্ষর। হাওড়া-১। দশ টাকা। **ও আমার সর্বনাশ ও আমার সর্বস্ব**—তরুণ মুখোপাধ্যায়। গোধূলীময় প্রকাশনী। চন্দননগর। হুগলি। সাড়ে সাত টাকা।

দেন। কবিতা রচনায় তাঁর দক্ষতা এবং সার্থকতা বিষয়ে আজ আর কোনো পাঠক অনভিজ্ঞ নন। এ বইটিতে কবিতার সংখ্যা এমন বেশি কিছু নয়, কিন্তু এমন এক ভাষায় এবং আধুনিক জটিল জীবনের ব্যঞ্জনায় কবিতাগুলির নির্মাণ যে অধিকাংশ কবিতাই বারবার পড়তে হয়। নাম-কবিতা কিংবা উদ্ভট পাহাড়ের রূপকথা কিংবা মারস্যুপিয়াল—আধুনিক জীবনধারার স্পন্দন, বর্তমান সময়ের ধমনীর শব্দ এই কবিতাগুলিতে এক রূপক আকারে ধরা পড়েছে। বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা কবি তাঁর স্বকীয় প্রকরণে প্রকাশ করেছেন। যে কবিতাগুলির উল্লেখ করেছি সেগুলো পড়তে মোটেই রমণীয় সুস্বাদু লাগে না বরং এক ধরনের ভয়াবহতার বোধ মনকে নাড়া দেয়। আমাদের এই সময় যে বিতৃষ্ণার রসে জারিত, যে অমানবিকতার গন্ধে উৎকট, কবিতাগুলি সেই বিতৃষ্ণা ও অমানবিকতাকে ধারণ করে উঠতে পেরেছে। সেই অর্থে এই কাব্যগ্রন্থটিকে বাঙলা কবিতার এক দিকচিহ্ন বলা যেতে পারে।

বইটিতে যে চোদ্দটি গদ্য আকারের কবিতা রয়েছে, তাদেরও মূল সুর এই ভয়াবহতা। কিন্তু কবি এই ভয়াবহতা এক নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন—যেন এটা স্বাভাবিক, যেন এই অবস্থার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। নিস্পৃহ ঠাণ্ডা গলায় তিনি তাঁর চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে যেন ধারাভাষ্য দিয়েছেন। উৎপীড়িত বা ক্ষিপ্ত হবার দায়িত্ব তো পাঠকের—তিনি শুধু বলে খালাস, এইরকম এক ভাব। যেমন—'বস্তুতপক্ষে, এক কথায় বলতে গেলে, মানুষের পাঁজর ফুটো করে গুলি চালানো আর দেশলাই কাঠি জ্বালা এখন একই কথা।' (প্রগতি) অথবা 'কেমন ধীরে ধীরে কংক্রীটের আচ্ছাদনে ঢেকে নিচ্ছি সত্তা, মন, অবয়ব! অর্ধদেহ প্লাস্টার করা হয়ে গেলে বাকিটা করে দেয় বন্ধুরা।' (শব্দ) এই গোত্রের কবিতার মধ্যে 'বরাহ-অবতার' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে যিনি আলোর ইশারা দেখতে পান এবং দেখাতে পারেন তাঁকেই কবি অভিধা মানায়। তাই উল্লিখিত কবিতাগুলির রচয়িতাকেই লিখতে হয় 'সীতা' এবং 'অহল্যা'।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি অমলিন ভালোবাসার কবিতার বই জিয়া হায়দারের "ভালোবাসা ভালোবাসা"। বইটির প্রচ্ছদ ভারি চমৎকার। সামান্য মুখবন্ধের প্রথম বাক্যটি পড়ে চমক লাগে—'এমন একটি সংকলনের বাসনা আমার আদৌ ছিলো না।' একজন কবির ভালোবাসার কবিতার সংকলনগ্রন্থ বের করার বাসনা হবে না, এ কখনো ভাবা যায়? কিন্তু তিনি এমন নির্মোহতার কারণ দেন নি। ছ'টি উপনাম-যুক্ত অংশে কবিতাগুলি সাজানো। কবিতাগুলির মূল সুর আত্মসমর্পণের। তাঁর প্রেমের মধ্যে এক প্রাচীনতার ছায়া। তাঁর প্রেম ঐতিহ্যগত - কি মনোভঙ্গিতে, কি ভাষায়। আধুনিক মানসিকতার নরনারীর সম্পর্ক-জনিত ভালোবাসা না-ভালোবাসার কবিতা এগুলি নয়। তাঁর প্রেম-সঙ্গীত এলিয়টের জগতের নয় বরং রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতেই এ কবির অবস্থান। যদিও দু-একটি বিচ্যুতি যে চোখে পড়ে না তা নয়। এমনকী জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে বা সমর সেন যে আধুনিক জটিল দৃষ্টিতে প্রেম বা প্রেমপাত্রীদের দেখে-ছিলেন জিয়ার কবিতায় তাও দুর্লভ। বোঝা যায়, তিনি জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের জমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। তার মধ্যেও তিনি সমকালের মানসিকতাকে এড়াতে পারেন না। সময় তাঁকে নাড়ায়। যুগচেতনার স্পন্দন শুনতে পাই কয়েকটি অসাধারণ কবিতায়—ভুজঙ্গিনী বিলাস, সমাপ্তি কথন, ভালোবাসার পদ্য, মাছুত ও হাতির সৌন্দর্যবোধ, বিয়াত্রিচে দান্তেকে যা বলতে পারতো অথবা হলুদ বসন্তের পদাবলী। যেখানে তিনি প্রেম বা প্রেমিকাকে এক অলৌকিক স্তরে উন্নীত করে বলেছেন—'মনোরম স্বর্গীয় যন্ত্রণা তুমি,/শুভ্রধারা—তরংগিত আনন্দ উল্লাস' ইত্যাদি (অলৌকিক) সেখানে পরবর্তী কালে তাঁর

গলাতেই শোনা যায়—'বরং দুজনে চলো নরকের অন্ধকার গলিত শহরে/নিয়ত যেখানে আমরা সংগ্রাম সংঘাত আর ব্যর্থতার মুখোমুখি হবো···' (বিয়াত্রিচে দান্তেকে) হায়দারের মধ্যে প্রেমের মাধ্যমে এক অলৌকিক অপার্থিব জগতে পৌঁছানোর ও সেদেশে বিচরণের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তা যে ওপরের পংক্তি-দুটির উচ্চারণে ভেঙে গিয়েছে, তিনি বাস্তবের কঠোর ও নোংরা পৃথিবীকে চিনেছেন—এটা আশার কথা।

মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে প্রথম কবিতার বই জলপাই কাঠের এসরাজের কবিতাগুলির থেকে বহুদূর সরে এসেছেন। গত দশকের প্রথমে "জলপাই" পড়ে কে না মুগ্ধ হয়েছিল? কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ "গোপনে হিংসার কথা বলি" পড়ে ওঠা সহজ নয়। না, ভাষায় দুরূহতা নেই। কবিতাকে অনর্থক জটিল শব্দবন্ধে জড়িয়ে পাঠককে আহত করার কোনো প্রবণতাও নেই। স্বচ্ছ সরল ভাষা, কিন্তু ভঙ্গিটি সহজ নয়। সাদামাটা কথার আড়ালে অনেক ইঙ্গিতরহস্য লুকিয়ে। অনেক না-বলা কথা। কবিতাগুলির আকার ছোটো, কারণ অনেক কিছু উহ্য। পদলালিত্যের স্পর্শ বাঁচিয়ে তিনি এক ধরনের শুষ্ক কঠিন প্রকরণের চর্চা করতে চেয়েছেন, যা একজন ক্ষমতাবান কবির পরীক্ষা করতে পারেন, কিন্তু তাতে কবিতার পাঠকবিমুখ হয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এ বইয়ের কবিতাগুলি পড়তে গিয়ে কোনো পাঠকের যদি মনে হয় এগুলি আমার জন্য রচিত হয় নি, নিশ্চয় কোনো গূঢ়বুদ্ধি-সম্পন্ন মনস্বী ব্যক্তিই কবির উদ্দিষ্ট, তবে আমি তাঁকে দোষ দেব না। অর্থাৎ মৃদুল জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাঁর কবিতার জন্য মুষ্টিমেয় পাঠকের কথা বিবেচনা করেছেন। তথাপি এখানে রসাবিষ্ট হবার মতো কবিতাও রয়েছে যা বারংবার পঠনের স্পৃহা জাগায়। যেমন—'তাহলে তুমিই লেখো তোমার বর্ণনা। /বৃষ্টি-ভেজা মৌমাছির ঝাঁক, অদ্ভুত পাতার গন্ধ—এ সমস্ত ব্যাখ্যা করো তুমি।/তুলে আনো অজানা ছাতার নিচে নিজেকেই—' (অহংকার) বইটির দ্বিতীয়ার্ধের নাম-করণ লক্ষণীয়—রান্নাঘর। কবিতাগুলির নাম এবং বিষয় কৌতূহলজনক, যেমন—উনুন, অম্ল, ঘ্রাণ, তাপ, মশলা, দুধ, জল, অতিথি, ক্ষুধা, আমার পাচকদল ইত্যাদি। চৌষট্টি কলার অন্যতম হল রন্ধন। পৃথিবীর বহু শিল্পী ও মনীষী ছিলেন রন্ধনপটু এবং বিচিত্র সুখাদ্যের স্বাদ গ্রহণে তৎপর। বিনোদবিহারী এবং সৈয়দ মুজতবা আলী রান্না নিয়ে গদ্যে অনেক কাব্য করেছেন। মৃদুলের রান্নাঘর সিরিজের কবিতাগুলি বাঙলা কাব্যে নতুন মাত্রার সংযোজন। এই কবিতা-গুলির লেখক নিজেকে কবি না ভেবে পাচক ভেবেছেন। আমারও মনে হয়েছে কবিতাগুলি তিনি যেন লেখেন নি, রান্না করে তুলেছেন। এরকম একটি কবিতার এই উচ্চারণ নিশ্চয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে—'স্পন্দন, আমি তাতে মাত্রা এনে খিচুড়ি ফোটাই।/খিচুড়ি আশ্চর্য খাদ্য। এমনকি যে পাচক—/সেও এই পরমান্নে মিলেমিশে যায়।'

হাসনা বেগম দর্শনের অধ্যাপিকা, দর্শনের কিছু বই তিনি বাঙলায় অনুবাদ করেছেন, কিন্তু মাঝে-মাঝে যুক্তির বেড়াজাল ভাঙা স্বপ্ন-কল্পনার এক রহস্যময় অবাধ্য শক্তি তাঁকে উত্তেজিত আর নেশাগ্রস্ত করে তোলে এবং তিনি কবিতা না লিখে পারেন না। একটা দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি আন্তরিকভাবে তাঁর এইপ্রকার কবিতা রচনা প্রয়াসের কাহিনী শুনিয়েছেন। সম্ভবত দর্শনের অধ্যাপনা করেন বলেই তাঁর মানসিকতাকে তিনি দার্শনিকভাবে দেখতে পেরেছেন, বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, নতুবা দম্ভের সঙ্গে বলতে পারতেন—কবিতা লিখি তো কী হয়েছে! যা হোক, তাঁর কবিতা প্রথানুগত। পরিণত হওয়ার জন্য আরো চর্চা আবশ্যক। প্রকৃতি ও প্রেমের কথাই এগুলিতে বলা হয়েছে। তাঁর বলার ধরনটা খুব ছড়ানো এবং এলোমেলো। তা সংহত এবং ধারালো করা প্রয়োজন। সেকেলে ভাব-ভাবনা উপমা-প্রতিমা বাদ দিয়ে আধুনিক মননের

চর্চা ও প্রয়োগ তাঁকে শিখতে হবে। তিনি যে তা আয়ত্ত করতে পারবেন এই বইয়ের কোনো-কোনো অংশে তার আভাস রয়েছে।

উনচল্লিশটি ছোটো-ছোটো কবিতা নিয়ে শঙ্করজ্যোতি দেবের "ঘুমের জানালা" বরাক উপত্যকার ভাষা-শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ-করা। আন্তরিকতা-সহকারে তিনি তাঁর নানা আবেগের সংহত ভাষারূপ দিয়েছেন। পতাকা, শহীদ প্রভৃতি কবিতায় বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের ছবি তীক্ষ্ণ আঁচড়ে ফুটে উঠেছে। ঘুম, নবান্ন, ঘর, শ্রম আর অপরূপ —এ কবির শক্তির পরিচয় স্পষ্ট। 'ওরা' কবিতাটি সম্পূর্ণ উল্লেখ করলে বোঝা যাবে তাঁর অনুভব ও ভাষার আকর্ষণী ক্ষমতা—'ওরা ডান নাকি বাম ওরা বুঝি ভালোবাসাহীন / বুড়ো পিশাচের মতো নীতি-হীন অনুভবহীন / আমার স্বদেশ জুড়ে আজ আশ্চর্য নীরবতা / খেলা করে ধর্মের দহন আর ঘৃণার কুসুম'।

"অতদূর যেতে পারি না"-র কবিতাগুলিতে সুভাষ দে এক নিজস্ব ভাষায় কথা বলেছেন যা আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে নি। আধুনিক হতে গিয়ে তিনি অযথা কথার মারপ্যাঁচ কষেছেন যাতে তাঁর শিল্প ঘুলিয়ে গিয়েছে। যেমন বইয়ের প্রথম কবিতাটিতে এই দুটি লাইন রয়েছে—'আইফেল টাওয়ার ছেঁচে তৃষ্ণার জল বালির পিপাসা / আকণ্ঠ শোষে রস ; লাল রস ; আঁতুড় সীমানা।' এর কী মানে আমি ধরতে পারি নি। কিছু অসংলগ্ন শব্দ বা চিন্তা পর-পর সাজিয়ে দিয়ে এক ধরনের কবিতা যে হয় না তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে এমন এক ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত তো থাকবে যা পাঠকের মন ছোঁবে, নাড়া দেবে। সুভাষ দের চেষ্টায় এর অভাব আছে।

তরুণ কবি সৈয়দ হাসমত জালালের "মেঘরঞ্জন" পড়ে একজন শক্তিমান কবির পরিচয় পাওয়া গেল, যদিও অধিকাংশ তরুণ কবির মতো তাঁর সব কবিতাই নিখুঁত নয়। গ্রন্থের নামকবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হতে হয়। শুরুতেই মন টানে—'বীজের ভেতর জেগে উঠছে স্পন্দন এবং মাটির ভেতর / জলের কলধ্বনি / অপরূপ সংকেতে কে তা জানালো আমায়।' বিমানবাহিনীর কর্মসূত্রে তিনি দেশের নানা প্রান্তে কাটিয়েছেন। তাঁর সেই প্রবাসযাপনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এ বইয়ের অনেকগুলি কবিতা। জল, জলদস্যু, বাগান-ভূমি, হিমঋণ এবং উষা—এই কবিতাগুলি আমার বেশ উজ্জ্বল মনে হয়েছে।

তরুণ মুখোপাধ্যায়ের "ও আমার সর্বনাশ ও আমার সর্বস্ব" প্রেমের কবিতার সংকলন। ভালোবাসা নিয়ে আবহমানকাল যে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে তা জেনেও এই কবি আর-একটি বই বের করলেন। নিবেদন গভীর কিন্তু উচ্চারণ প্রথাগত। নতুন সুরের রেশ পেলাম না। কয়েকটি কবিতার পংক্তি এবং অভিব্যক্তি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে মনে পড়ায়। যেমন—'তোমাকে বিমর্ষ দেখলে কিছু ভালো লাগে না আমার' অথবা 'কিশোরীর ফ্রক জুড়ে কস্তুরীর ঘ্রাণ—' ইত্যাদি। কবিকে নিজস্ব ভাষার অনুসন্ধান করতে হবে। চারুমানের আঁকা বইটির প্রচ্ছদ চমৎকার।

প্রবীণ বিপ্লবী বঙ্গেশ্বর রায়ের দুখানি উপাদেয় গ্রন্থ

অরুণা হালদার

নিম্নোল্লেখিত গ্রন্থ দুটির লেখক বঙ্গেশ্বর রায় এই দুখানি উপাদেয় গ্রন্থ আমাদের দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক রকম আগাছা আজকাল দেখা যায়। সেই আগাছা-সাহিত্যের জাতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক ধরনের রচনা আছে যার একটি মহৎ মূল্য আছে। এ রচনাও সাহিত্যবিচারে উত্তীর্ণ সাহিত্য এবং বঙ্গেশ্বর রায় তথাকথিত প্রথিতযশা সাহিত্যিক না হতে চাইলেও তাঁর প্রথম বইখানি ("ঢাকা আমার ঢাকা") একটি স্নিগ্ধ অনবদ্য কৌতুকরসসমৃদ্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

ঢাকা আমার ঢাকা—বঙ্গেশ্বর রায়। পচিশ টাকা। **মনে রেখো**—বঙ্গেশ্বর রায়। তিরিশ টাকা। প্রকাশক বাণী রায়, আই. জে ৬ কুষ্টিয়া সরকারি আবাসন, কলিকাতা-৩২।

"ঢাকা আমার ঢাকা" গ্রন্থের স্বাদ পৃথক ধরনের ও বস্তুত পরম উপভোগ্য। পড়তে গেলে ভুলে যেতে হয় যে, এ গ্রন্থের লেখক আশৈশব মসী ছেড়ে অসি ও বন্দুকের চর্চা করেছেন—কারাবাস, কারাকক্ষের নির্যাতন, অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজনসহ হাতকড়ি ডাণ্ডা-বেড়ির সাজা, আদালত-হাজত-জেল এবং অবশেষে সাগরপারে আন্দামান সেলুলার জেল তাঁর ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করেছে। পরবর্তী কালে ছাড়া পেয়েছেন। ব্যক্তিত্ববিকাশের পথেই এসেছে সমাজতন্ত্রবাদের দীক্ষা ও দীক্ষান্তকর্মপ্রয়াস এবং পদ্ধতিপ্রয়োগ তথা ঘরসংসার। এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে দুটি গ্রন্থের মধ্যে লেখক যেন এক প্রবল ব্যক্তিত্ব হিসাবেই সঞ্চরণ করে বেড়ান। লেখার মধ্যে এমনতর ব্যক্তিসত্তার আন্তরিক অভিব্যক্তি শেষে উত্তীর্ণ হয় কৌতুকরসে। আমরা ভুলতে পারি না কৌতুক মানেই কাঁদতে কাঁদতে হাসা অথবা হাসতে হাসতে কাঁদা। ব্রিটিশ শাসকের বিরোধী এ ব্যক্তিত্বে আশ্চার্য উপলক্ষিত হয় অনবদ্য কৌতুকরস যেটা এখন পর্যন্ত ইংলিশ হিউমার বলেই বলা হয়—সেটা ফ্রেঞ্চ স্যাটায়ার নয় বা ব্যঙ্গশ্লেষও নয়।

পূর্বোক্ত বিচারে "ঢাকা আমার ঢাকা" লেখকের স্নিগ্ধ এক সাহিত্যকৃতি। শ্রদ্ধেয় রণেশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকাটি একটি মূল্যবান সংযোজন। ঢাকার লেখক হিসাবে বঙ্গেশ্বর রায়ের এই গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে ঢাকা আর ঢাকার মানুষ। সে মানুষ কু এবং সু—দুই-ই। কুখ্যাত মানুষ দারোগা অবিনাশ গুহর যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তার পটভূমি নির্যাতিত বন্দীর কঠিন যন্ত্রণার স্মৃতি থেকে সংগৃহীত। কিন্তু সেই সংগ্রহমন্থনে বিষের তীব্রতা কম—তা mellowed হয়েছে যেন ভাষা ও কৌতুকের নবনীত-অমৃতে। আশ্চর্য নিপুণ হাতে ফুটে উঠেছে অবিনাশ দারোগার আদ্যন্ত একটি চিত্র যাঁদের সুবিধাবাদী চরিত্র ব্রিটিশ মনিব স্বদেশী মনিব সকলের থেকেই সুবিধা আদায় করার সহজ উপায় সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো আয়ত্ত করে আসে। বইটিতে পাঁচটি আলেখ্য ও একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। কবিতাটি কমরেড রাবেয়ার জীবনালেখ্যও বলা যায়। বইখানির আর-একটি প্রসাদগুণ হল তিনি আশ্চর্যভাবে আমাদের এক ঢাকায় নিয়ে উপস্থিত করেন যেখানে দ্বিধাবিভক্ত হিন্দুস্তান-পাকিস্তান-বাঙলাদেশের কথা মনে হয় না। থাকে শুধু ঢাকার "বাঙ্গাল" তথা বাঙালি। কেমন করে যেন প্রাকবিভাগ ঢাকা ও বিভাগোত্তর ঢাকা মিলে যায়। মনে হয়, লেখকই তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্বে এই সমন্বয় সাধন করেছেন। সে সমন্বয় জেনুয়িন হওয়াতে আর এদেশ-ওদেশ ভেদ মনে পড়তে পায় না।

তিনি অবিনাশ দারোগাকে কুকীর্তিমান হিসাবে চিরস্থায়ী করেছেন। ঢাকার গাড়োয়ানের বুদ্ধিচাতুর্য সহ তাঁর ভিতরকার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের চাবুক যে তাঁর হাতের চাবুকের মতোই ধারালো তার চিত্র একেছেন। ছাদপিটানি গান যে ওখানে শিশু বা কিশোর দল নিয়ে সংগৃহীত হয় সেকথাও আমরা জানতে পারি। আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়েই বুঝি সেই শ্রেণী বা কমিউনিটিগত মানুষদের আশ্চর্য শার্পনেস এবং রেডিউইটেডনেস। সে জানায় অবশ্য দুঃস্থ মানুষের কথা আর অনশনজীর্ণ মূক পশুগুলির দুঃখ আরও তীক্ষ্ণতর ভাবে চিহ্নিত হয়। তাহলেও জীবনবোধ ও জীবনানন্দ সেই মানুষদের বেঁচে থাকার শক্তি দিয়েছে, এটা বোঝা যায়। আমরা বিস্ময়ানন্দে অনুভব করি—এত রকম বিপর্যয়বিঘ্নবিপদের মধ্যেও

যা লেখককে জীবনরসধারা থেকে বঞ্চিত করে নি, তা হল তাঁর এই গভীর জীবনতৃষ্ণা থেকে উত্থিত হাস্যরসের অনাবিল পরিবেশনা।

২৭ পৃষ্ঠায় আছে "যুবতী বসাক"। লেখকের মতে এমন "রমণীগন্ধা পুরুষের নাম কয়েকপাতা ভাবিয়া লিখিলে এই কাহিনীর স্বাদ ভারাক্রান্ত হইবে"। কিন্তু, এমন অনেক আরও নাম ছিল যেমন "অচলা বসাক, মিনতি বসাক, প্রমীলা বসাক, ফুলেল বসাক ও যূথিকা বসাক"। এও একটা জানা গেল শ্রেণীগত নামবৈচিত্র্য। এই যুবতী বসাক অভিনয়পটু। স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় ভালো করে। অপরদিকে সে পিতৃহীন সংসারের অভিভাবকত্ব কিশোর বয়সে কাঁধে তুলে নেয়। ব্রহ্মদেশসীমান্তে কাপড়ের ব্যবসা করে ফিরে আসে। মাকে শোনায় সেই ব্রহ্মদেশী-মহিলাদের কথা। তাতে তার মা শঙ্কিত হয়ে বিবাহব্যবস্থা করেন। বধূটি মাত্র এগারো বৎসরের হলেও ধানিলঙ্কার মতো তেজি। তার 'সরে যাও' কথাটিতে যুবতী বসাক সোজাসুজি ময়মনসিং গিয়ে পত্র দেয়—'আর কত দূরে সরিব।' তৎক্ষণাৎ তাকে আনার ব্যবস্থা হয়। অনুমান করা যায় মধুরেণ সমাপয়েৎ। এও সেই ঢাকার মানুষদেরই পরিচয়।

লেখকের রচনায় যেমন ঢাকা বরাবরের মতোই প্রত্যয়ে আমাদের মনে সাড়া দেয়, তেমনই তাঁর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে স্থূল ভেদরেখা টেনে মানুষকে মানুষের থেকে পৃথক করা হয়, সেই ভাবনাও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। দীর্ঘ কবিতালেখ্য রচনাটি কমরেড রাবেয়ার পূর্ণ চিত্র। মুসাভাই পরিচয়ে রমেন সে বাড়িতে ছিলেন। রাবেয়া তাঁর সামনে বড়ো হয়েছে। তাঁর সহকর্মী সহমর্মী হয়ে উঠেছে। পরিণত জীবন পরিণত মন সহ রাবেয়ার উক্তি আশ্চর্য মনে হয়—'আচ্ছা রমেন, তুমি আমার কে—আমি তোমার কে, সত্যি বলো তো—'

'মুখ মোর মূক হয়ে থাকে নিঃশব্দে কেটে যায় প্রতিশেষক্ষণ; চোখ মোর জলে ভরে যায়—'

রাবেয়ার উক্তি অবশেষে 'ধীরে ধীরে বলে গেলে—

ভাই নও, দোস্ত নও
সোহাগা প্রেমিক নও, নও তুমি দুলা
রমেন: আমার জীবনে তুমি
প্রথম কমরেড।'

সমস্ত কবিতাটি পড়লে পাঠক একটি গভীর আন্তরিক তৃপ্তি পাবেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমাকে দুদুমিঞার কাহিনী আকৃষ্ট করেছে বেশি। এ চরিত্র অজানা নয়। গোপাল হালদার মহাশয়ের "ত্রিদিবা" শীর্ষক ট্রিলজির দ্বিতীয় ভাগে "অন্যদিন" পর্বে—বিশ্ববিদ্যালয় অংশে কারাগারের ফালতু রঘু কয়েদির কথা দাগ কেটে মনে থেকে যায়। সে 'রঘুচোরঅ' ঠিকানা দেয় নি, কারণ 'চোররঅ বিশ্বাস নাই'। এখানে ঢাকা জেলে পুরাতন চার নম্বর হাজত ওয়ার্ডে সিনিয়ার ও জুনিয়ার রাজনৈতিক কয়েদিদের একজনা ফালতু হলেন দুদুমিঞা। 'ঢাকা শহরের এক আদিম গরিব অধিবাসী দুদুমিঞার জীবনসন্ধ্যা' এই কথিকাটির উপজীব্য। লেখকের মতে তিনি "অনন্য"। দুদুমিঞা ব্যতীত একজনা হিন্দু ফালতুও আছেন। সলজ্জ দুদুমিঞার কাছে তাঁরা "ফ্যালসানি" কথাটির গূঢ় অর্থ বার করে শোনেন। দুদুমিঞা ক্রমে বোঝেন এই রাজনৈতিক কয়েদি বা কমিউনিস্ট যাই হোক তাঁরা এক পৃথক জীব। মুসলমানের জল তাঁদের আচরণীয়। তাঁদের পরিচয় পাবার পর দুদুমিঞা তাঁদের কাছে ক্ষমা না চেয়ে মাথা কুটছিলেন ওই 'ফ্যালসানি' কথাটা তাঁদের সম্বন্ধে ভ্রমবশত ব্যবহার করেছেন বলে। ক্রমশ দুদুমিঞার সুখদুঃখসহ তাঁরা পরিচিত হয়ে ওঠেন—বিশেষ ভাবে লেখক স্বয়ং ও নেপাল নাগ মহাশয়। তাঁরা শোনেন দুদুমিঞা কিভাবে গাঁট কেটে ধরা পড়েন—কোনো জাতভাই তাঁকে ছাড়াতে আসে নি এবং তিনি নিজেই নিজের মোকদ্দমার সওয়াল করেছিলেন। দুদুমিঞার ভাঙা

পরিবারে অবশেষে এক বাঙ্গালনী ছিলেন। তাঁকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে আসার দুঃখ তাঁর যায় নি। খবর নিতে যাকে পাঠালেন সেই মুক্ত কয়েদি সেই অসহায় নারীকেই গ্রহণ ও নিগ্রহ দুই করতে থাকল—দুদুমিঞা তা বিস্মৃত হতে পারেন না।

লেখক অনুভব করেন, 'একজন সাধারণ মুসলমানের চোখে আমরা মন খুলিয়া সকল আচার বিচার দূরে রাখিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষের এক নিকট সম্পর্ক গড়িতে পারিয়াছি।...সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে যে আমাদের সঙ্গে মুসলমানের কোনো ভেদ-বিভেদ নাই। আমরা হিন্দু হইলেও আমাদের জাতপাত নাই।'

দুদুমিঞার আপত্তিরশে জনার্দন ফালতু তাঁদের পানীয় জল আনতে পায় না। দুদুমিঞা বলেন: 'ওই হালায় নমঃশূদ্র চাড়াল অর হাতে আপনারা পানি পিয়াইতে পারবেন না। আমি থাকতে তা হইতে দিমুনা।' ...'দুদুমিঞার হিসাব অনুযায়ী সে মুসলমান হইলেও তাহার ছোঁওয়া কিছু খাইলে আমাদের জাত-মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিন্তু হিন্দু জাতের নিচুতলার চাড়াল, নমশুদ্দুরের ছোঁয়া খাইলে আমাদের জাত-মানের সর্বনাশ হইবে।' এই আশ্চর্য কাহিনীটি একটি সাচ্চা মানুষের সত্যকাহিনী এবং একজন সাচ্চা মানুষের রচনায় বিধৃত হয়েছে। এই দুদুমিঞা জেলের থেকে আসার দিন আর বাবুদের সাথে দেখা করেননি। একরকম লুকিয়ে পালিয়েছিলেন। পরিশেষে তাঁর সাথে ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে এক সকালবেলায় দুদুমিঞার সাথে দেখা হয় কমরেডদের কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে। পরিচিতরা এসে তাঁকে সাগ্রহে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু সেই মানুষের মুখে মৃত্যুর ম্লানছায়া সম্ভবত 'ঘোলাটে পাণ্ডুর বর্ণে লেপিয়া আছে'। গায়ে শতছিন্ন লুঙ্গি ও গেঞ্জী। আত্মসম্মান-যুক্ত দুদুমিঞার হাতে সামান্য অনুদান কোনও মতে দিয়ে সেদিনকার বিদায় ঘোষিত হল। দুদুমিঞার হয়ত দুদিনের বেশি জীবনীশক্তি ছিল না এবং তাঁর বাঙ্গালনীর কথাও অজানা থাকল। তবু মনে হয় আরও কিছু প্রত্যাশিত ছিল—এটুকু আশ্রয়ব্যবস্থা হয়তো সেদিন তাঁরা করতে পারেন নি। অনেক দুঃখী গরিব নিরাশ্রয় অজ্ঞাত মানুষের মতোই 'দুদুমিঞা টলিতে-টলিতে' চলে গেলেন। জীবনে ট্রাজিডির নায়ক-চিত্র বর্ণনা বড়ো কঠিন এবং বড়ো করুণ। আমাদেরও একটু প্রত্যাশা যেন ক্ষুণ্ণ হয়। দুদুমিঞার আরও কিছু প্রয়োজন ছিল—তা মেটে নি—মিটত না।

লেখক বরাবর একেবারে ঢাকার ভাষা ব্যবহার করেছেন। সে ভাষা বুঝতে কোনও কষ্ট হবার কথা নয়। ঢাকার মানুষ ঢাকার কথা, ঢাকার মানুষদের কথা ঢাকার ভাষাতেই বলবেন—এই তো স্বাভাবিক। তাতে এতটুকুও রসভঙ্গ কোথাও হয় নি। বরঞ্চ আমার মতো যারা অনেকে শ্বশুরালয় সম্পর্কে কোনও-দিন ঢাকা দেখিনি ঢাকায় যাইনি অথচ প্রায় অর্ধশত বৎসর ঢাকার বাঙালবাড়িতে সেই ভাষার ও সেখানকার খাদ্যের ছায়ায় দিন কাটালাম, তাদের পক্ষে এ গ্রন্থের ভাষা যথেষ্ট উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে। আত্মীয়তার সূত্র পেয়েছি সেদিনের প্রাক-বিভাগ ঢাকার সাথে আজকের ঢাকার কিছুটার।

লেখক বইখানির উৎসর্গপত্রে লিখেছেন 'বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেসকল মুসলমান ও হিন্দু গরীব অধিবাসীরা জন্মগ্রহণ করিয়া এখনও ঢাকা শহরে জীবিত আছেন তাহাদের উদ্দেশে 'ঢাকা আমার ঢাকা' বইখানি উৎসর্গিত।' বইখানির জন্য বাঙালি পাঠক-সমাজ লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। বাঙলা সাহিত্যে এটি একটি সাধু ও সৎ সংযোজন। লেখকের না-বলা কথাটি আমরা উচ্চারণ না করে এ লেখা শেষ করতে পারি না—'বাঙালির পণ বাঙালির আশা বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা—সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান।'

"মনে রেখো" বইখানি বঙ্গেশ্বর রায় মহাশয়ের আর-এক ধরনের গ্রন্থ। এখানে সাহিত্যের চেয়ে তথ্য ও

উপাদান-সংগ্রহ বেশি। একথা বলা দরকার যে উপাদানগুলির অনেকাংশই তথ্যগত ও একান্ত মূল্যবান। এমন কিছু তথ্য এখানে পাওয়া গেল যা একেবারে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন থেকে গৃহীত। পাওয়া গেল তাঁর আকৈশোর সাধনার একটা ইতিহাসও। একটি বারো বৎসরের ছেলে ঢাকার বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অকুতোভয়। তাঁর সঙ্গীসাথী সকলেই কোনও না কোনও অ্যাকশনে সংযুক্ত। কেউ ধরা পড়েন, নির্যাতিত হন, কারারুদ্ধ হন। কেউ ঘটনাস্থলেই মারা যান। কেউ নিজেই মৃত্যুর পথ বেছে নেন গুলি করে বা সায়নাইড খেয়ে। আর কেউ মারা যাচ্ছেন দেশী-বিদেশী পুলিশি অত্যাচারে। বিদেশী শাসকের অনুচর দেশী দারোগা ও দেশী পুলিশকে তাঁরা ঘৃণা করেন। বিদেশীদের তো শত্রুজ্ঞানই করেন। এই পথে তাঁরা বহু অজানা পরিবারে আশ্রয় পান—স্নেহ ভালবাসা পান অজ্ঞাত অপরিচিত মা-বোনদের কাছেও। সেই অগ্নিদিনের অগ্নিসেবকগণও অগ্নিগর্ভ। তাঁদের অনেকেরই লেখা স্মৃতিকথা বর্তমান। আন্দামানে নির্বাসিত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাসিতের আত্মকথা, সুধীরকুমারের সাগরঘেরা পাথরকারা, ৺মধু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা মুক্তিপীঠ আন্দামান এবং আরও কিছু বইয়ের নাম তাঁর গ্রন্থে আছে। নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে একটি দীর্ঘ তালিকায় হতাহত বন্দীদের নাম ও কে কোন্ অ্যাকশনে সংযুক্ত তার বিবরণ আছে—মনে হয় সেই তালিকাটিতে শ্রীযুক্ত রায়েরও অবদান আছে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন সতীশ পাকড়াশী, নিকুঞ্জ সেন, কালীচরণ ঘোষ এবং আরও কয়েকজন। দুঃখের কথা এই যে, এ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ এজাতীয় ইতিহাস আমরা পাই নি এখনও। কেমন ভাবে কী করে এই বিপ্লবী জীবনে সারা ভারতের লোক যোগ দিয়েছিলেন, একথা গান্ধীবাদ সচেতনভাবে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিরোধিতা করে চাপা দিয়ে গেল তা ভাবতে আমরা ক্লেশ বোধ করি। লজ্জাও বোধ করি যখন দেখি সরকারি ইতিহাসের সম্পাদক (ড. তারাচাঁদ সম্পাদিত)-এর সঙ্গে মত-ভেদ হওয়াতে এই বিষয় নিয়ে প্রবীণ ঐতিহাসিক ড. রমেশ মজুমদার মহাশয় উক্ত সংস্থা থেকে সরে আসেন। এসবই আবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আজাদ হিন্দফৌজের সংগঠক নেতাজী সুভাষ বসুর জীবনচর্চায়। আরও উজ্জ্বলতর দিক ছিল তাঁর সর্ব-ভারতীয় চরিত্রে গঠিত ফৌজি ঐতিহ্য। এবং সেখানে যে সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমান স্বেচ্ছায় আপন মানবতার দায়িত্বে সম্মিলিত হয়েছিলেন এই কথাটা মনে করার মতই বড় কথা। অগস্ট বিপ্লব ঠিক এজাতীয় অভ্যুত্থান হয় নি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর প্রকৃতপক্ষে তার উত্তরচিত্র আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজেই পাই। দুই ক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে আদর্শ নিয়ে এক দেশের সন্তান হিসাবে লড়াই করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণও দিয়েছেন। একটু প্রসঙ্গ-চ্যুতি হলেও আজকের দিনের মন্দির মসজিদ নিয়ে রণক্ষেত্রের রাজনীতি করার কালে একথা মনে করার সময় এসেছে সকল শিক্ষিত সজ্জনেরও, দরিদ্র অশিক্ষিতেরও। অন্যথায় কিছু মানুষের লোভ বহু মানুষের ক্ষোভের কারণ হচ্ছে।

আমরা সানন্দে বঙ্গেশ্বর রায় মহাশয়ের রচনায় এই সমন্বয়ধর্মটি লক্ষ করি। তিনি এটি সমস্যামূলক মনে করেন নি বলেই এত সহজে তাঁর গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমানের একত্র হয়ে আদর্শ গ্রহণের কথা এসে গেছে স্নিগ্ধ সহজ ভাবে। তাঁর গ্রন্থে বা পূর্বোক্ত অপরাপর গ্রন্থে স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে মুসলমান বিপ্লবীর নাম তুলনামূলক ভাবে কমই। কিন্তু, অন্যান্য গ্রন্থে যেমন মুসলমান নাম প্রায় দেখাই যায় না, অন্তত এ গ্রন্থে তা নয়। কেন কম তার একটি কারণও আছে। অধিকতর বিপ্লবী এসেছেন পূর্ববাঙলার নানা স্থান থেকে এবং পশ্চিম-বঙ্গের মেদিনীপুর থেকে। পূর্ববাঙলার তদানীন্তন

ইতিহাসে লজ্জাকরভাবে চোখে না পড়ে পারে না যে মুসলমান ধনী পরিবারের সংখ্যা বাদ দিলে অধিকাংশ মুসলমান দরিদ্র এবং দারিদ্র্যবশত অশিক্ষার শিকার। সেক্ষেত্রে তাঁদের রাজনীতি করার সুযোগ কতটুকু ছিল যখন শিক্ষাই পাওয়ার সুযোগ ছিল না। সুতরাং কম হলেও আমরা তাঁর গ্রন্থে কয়েকটি মূল্যবান মুসলমান শহীদের কথা পাই। এ গ্রন্থের এটাই বিশিষ্টতা।

এখানে আবারও একটু প্রসঙ্গচ্যুতি হলেও একটা কথা বলার দরকার মনে করি। পূর্ববঙ্গ বা পূর্বভারত প্রাক্-মুসলিম যুগে প্রায় বৌদ্ধ-অধ্যুষিত ছিল। গুপ্তবংশ, পালবংশ ও সেনবংশের রাজত্বকালে হিন্দু অভ্যুদয় ঘটে এবং সেই সময় থেকেই বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার শুরু হয়। রাজা শশাঙ্কের সময় এটা খুব বেশি হয়। সমাজের নিম্নস্তরে এই বৌদ্ধদের রাখা হত ও সেইভাবে দেখা হত। এর থেকে এবং অকারণ লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার পাবার আশায় নিপীড়িত বহু নরনারী এসময় কিন্তু আশা ও আশ্বাস খুঁজছিলেন। দশম শতাব্দীতে ও তার আগে থেকেই ইসলামি বণিকদের এবং সেইসঙ্গে ফকির, পীর ইত্যাদি সহ সুফীদের আনাগোনা হতে থাকে। রাজা লক্ষ্মণ-সেনের সময়ও কালো-উষ্ণীষধারী কৃষ্ণবেশ-পরা সুফী পীরের বর্ণনা পাওয়া যায়। পাওয়া যায় ইসলামের কথা শূন্যপুরাণে—এবং এখনও পাওয়া যায় গ্রামগঞ্জে হিন্দু-মুসলানের ঘরে সত্যপীরের পূজায় ও কথায়। তাঁর জন্য তৈরি হয় মোকাম এবং তাঁর প্রসাদ হল শিরনি। এইভাবে সন্তপীরদের শান্ত কথাবার্তায় পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের নির্জিত বৌদ্ধ সম্প্রদায় নবীন আশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামে ধনী-দরিদ্রের ভেদ থাকলেও মানুষ-মানুষে সমভাবাপন্ন ভাবার আশ্বাস আছে। সুধী পাঠক আশা করি আমার এই অংশের রচনাটুকু অনুধাবন করলে বুঝবেন দলিত বৌদ্ধ ও অনগ্রসর মুসলমানের নির্জিত হবার কারণটা একই ছিল। যে কজন বিপ্লবী মুসলমানের নাম আমরা পাই তাও তো কম নয়। ওয়াহাবি আন্দোলন ফরাজি আন্দোলনের কাল থেকেই তাঁরা ইংরাজের বিতাড়ন চান। এ ঐতিহ্যও ১৮৫৭ থেকে একাল পর্যন্ত চলে এসেছে। যাঁরাই আত্মগোপন করেছেন তাঁরা মিলে মিশে গেছেন সমাজের দলিত পতিত গরিবদেরই সঙ্গে। (এরকম কাহিনী নিয়ে রচিত—সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের দুই পুরুষ গ্রন্থ)।

প্রসঙ্গে ফিরে এসে আমরা বঙ্গেশ্বর রায় মহাশয়ের গ্রন্থে কয়েকটি চরিত্র পাই, কয়েকখানি চিত্রও পাই। এগুলি স্বচ্ছন্দভাবে তিনি অঙ্গীকার করেছেন দেশ-মাতার সন্তানদের চরিত্র ও চিত্র হিসাবে। ভিন্নধর্মী মুসলমান শহীদ বলে নয়, এই সত্যটি পরম সত্য বলেই প্রসন্নতা আনে। তা না হলে এমন একটা ভ্রান্তধারণা অঘোষিত নিয়মে রয়ে গেছে যে বিপ্লবী সংস্থা কিংবা কংগ্রেস সবই মূলত হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান জাতীয় অন্যায্য রটনা ও স্বার্থপ্রণোদিত প্রয়াস। এ গ্রন্থে প্রধানত আমরা পাই শহীদ মহম্মদ শের আলির কথা। "পানিঘাটার পবিত্রভূমি," মাউনট হেরিয়টার সমুদ্রতীরে মহম্মদ শের আলি লর্ড মেয়োকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন। ভাইপার দ্বীপে পুরানো জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। আলোচ্য গ্রন্থে পানিঘাটার সেই অ্যাকশন স্থানটি এবং ফাঁসিমঞ্চের স্থানটির (ভাইপার দ্বীপের) ফটো আছে। বস্তুত, ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত বড় বড় দলে বিদ্রোহী সিপাহীদের অন্তত আড়াই হাজার জনাকে এই আন্দামান-নিকোবর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে চাথাম রস ও ভাইপার দ্বীপে পাঠানো হয়েছিল। এতে করে সেসব দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। আজ সে প্রজাতি বিপন্ন। এই আড়াই হাজার মানুষের অনেকেই অপরিচয়ের অন্ত-রালে গুলির আঘাতে অত্যাচারে অনাহার-অর্ধাশনে মারা যান। পালাবার চেষ্টা ব্যাহত হয় আদিম অধি-বাসীদের তীরে নয়ত জলের হিংস্র জীবের হাতে। কিছু লোক সেখানে বন্দিনী নারী সহ অর্ধমুক্ত জীবনে

সংসারও করে স্থিত হয়েছিলেন জানা যায়। জানা গেছে মাত্র উনত্রিশ জনার নাম। গ্রন্থে যাঁদের নাম আছে তাঁদের মধ্যে পাওয়া যায়: অসম: গাঁও বুড়ো বাহাদুর সিং, দুতিরাম বড়ুয়া, মধু মল্লিক, শেখ ফরমাদ আলি; বিহার: নারায়ণ; ওড়িষা: হাতী সিং; সংযুক্ত প্রদেশ: আলামা ফজলুল হক, হিমানোহাল সিং, কুরা সিং লিয়াকত আলি, লোমী সিং; মধ্যপ্রদেশ: বাহাদুর সিং, ভীম নায়ক, দেবী ফুট্টা, গুলাব খান, জহর সিং, মহিবুল্লা, মজু শাহ, মায়া রাম, নুরা, কাইম খান, সিরাজুদ্দিন, ভেঙ্কট রাও; গুজরাট: গরবদাস প্যাটেল; হায়দ্রাবাদ: মৌলভী সৈয়দ আলাদ্দিন। আরও তিনটি নাম আছে। ঠিকানা-বিহীন এ তিনটি নাম হল দুধনাথ তেওয়ারী, মীর জাফর আলি থানেশ্বরী এবং নিরঞ্জন সিং। এঁদের মধ্যে আলামা ফজলুল হক ছিলেন প্রখ্যাত উর্দু কবি মীরজা গালিবের পরম বন্ধু; মীর জাফর আলি থানেশ্বরী একমাত্র বন্দী যিনি দীর্ঘ বিশ বৎসর সাজা খেটে মুক্ত মানুষ হিসাবে মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসেন। এছাড়া সকলেই নির্যাতনে শেষ হন।

নির্বাসনে ওয়াহাবি বন্দীদেরও পাঠানো হয়। বহু নির্বাসিত নামহীনের মধ্যে পূর্বোক্ত শের আলির নামটি পাওয়া যায়। আর আছে পাটনা মামলার আহমদউল্লার নাম, মালদা মামলার আমিরুদ্দীন, আর রাজমহল মামলার ইব্রাহিম মণ্ডল ও আম্বালা মামলার ইয়াহিয়া আলির নাম। ১৮৭২-৮০ সালে মহারাষ্ট্রে জাগ্রত বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে শহীদ বলবন্ত ফাড়কের নাম পাওয়া যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'রামেসিন' বা ঠগীভাষাভাষী এক দুর্দান্ত দস্যুদলীয় মানুষেরা। সাত-আট মাস লড়াই করার পর ফাড়কে ধরা পড়েন ও এডেন-এ নির্বাসিত হন। তাঁর সঙ্গী কর্মীদের পাঠান হয় আন্দামানে বলে বলা হয়। (সঠিক খবর প্রমাণ মেলেনি এখনও)। তারপর থেকে অবশ্য খুলে গেল দ্বার, তখন থেকেই একটি বৃহৎ কারাগার নির্মাণের পরিকল্পনা হয় তার ফল এই সেলুলার জেল। বিরাট তার আকার—সাতটি বাহু প্রলম্বিত অবস্থায় এবং একটি পরিদর্শনাগার থেকে প্রতিটিকে লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা ছিল। দুইয়ের কথা আমরা জানি আজ ওই সাতটি শাখার মাত্র চারটি শাখা বর্তমান। এই চূর্ণীকরণ ব্রিটিশ সম্পাদিত নয়—এটি এদেশী সরকারের অনুমোদিত তথা অবহেলনপ্রসূত মনোভাবজাত। এমনও হতে পারে একটা মহৎ ইতিহাস লোপ করার আত্মবিলোপী মূর্খতাজনিত ধূর্ততা এর পিছনে বর্তমান।

পূর্বোক্ত যেটুকু ইতিহাস বঙ্গেশ্বর রায় দিয়েছেন তা থেকে এটুকু প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় স্বাধীনতার বিপ্লব-যজ্ঞে সর্বভারতীয় যাঁরা স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান স্বাঙ্গীকৃত। মুসলমানের সংখ্যা প্রাসঙ্গিক ভাবে কম। তার কারণ পূর্বে বলেছি। পরের দিকের সেলুলার জেলের ইতিহাসে এল ১৯১০-১৯২১ পর্যন্ত সমাগত বন্দীর দল। তার মধ্যে ছিলেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শহীদ ইন্দুভূষণ রায় ও ত্রৈলোক্য মহারাজ (চক্রবর্তী) প্রমুখেরা। তৎসহ পাওয়া যায় সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়, বাবা পৃথীসিং, রওশনলাল, পণ্ডিত রামরক্ষা (শহীদ) এবং মুজতবা হোসেন প্রমুখ অনেকেই। ভারত সরকার এঁদের সকলকেই ভয়ানক ভীতিপ্রদ মনে করত। অত্যাচারের ও সাজা খাটুনির অবধি ছিল না। ইন্দুভূষণ আত্মহত্যা করেন—উল্লাসকর দত্ত উন্মাদ হয়ে যান। পণ্ডিত রামরক্ষার উপবীত কেড়ে নেবার ফলে আমরণ অনশন করে তিনি শহীদ হন। ভানসিং-পিটিয়ে মারা হয়। গদরবন্দী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কেহার সিং রোগাক্রান্ত হয়ে মারা পড়েন। অনশন-কালে জবরদস্তি করে খাওয়ানোর ফলে ফুসফুসে খাদ্য গিয়ে নিউমোনিয়াতে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান মহাবীর সিং, মোহিত মৈত্র এবং মোহনকিশোর নমোদাস। শেষোক্তগণ দ্বিতীয় পর্বের বলি (১৯৩২-১৯৩৮)। এখানেও সেই সর্বভারতীয় আত্মদান অভিব্যক্ত এবং জাতপাতের বালাইও নাই। এঁদের মধ্যে গ্রেপ্তারের তিনদিন আগে উক্ত মোহিতমোহনের বিবাহ হয়েছে। এ কথায় বিহারের বিপ্লবী কর্মী বৈকুণ্ঠ শুক্লার কথা মনে পড়ে যায় (নামটি ঠিক কিনা সংশয় জাগে) তাঁর ফাঁসির দড়ির দিকে যাবার আগে তিনি চীৎকার করে সহকর্মীদের বলেন বিহারে বাল্য-বিবাহপ্রথা বন্ধ করার প্রয়াস করার জন্য। (বিভূতি দত্ত মহাশয়ের মহাবরযার রাঙা জল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য এ-বিষয়ে)। পূর্বোক্ত কয়জনা ছাড়াও শহীদ হন মোহিত অধিকারী, মহেশ বড়ুয়া, সুশীল দাশগুপ্ত এবং মহম্মদ ইব্রাহিম (তারাপদ ছদ্মনাম)। ১৯৪৬-এ তৎকালীন মুক্তিপ্রাপ্ত ইব্রাহিম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে নিজ বিড়ির দোকানে দুঃখজনক ভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

লেখক এই বইখানিতে ঠিক একটি কোনও মেথড অবলম্বন না করায় প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে কিছু অসুবিধা ঘটেছে। প্রথমদিকে তিনি একভাবে ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপটের অবতারণা করেন এবং (১) ১৯১৪-১৯৩৪ পর্যন্ত যে সকল আশ্চর্য ব্যাঙ্ক ডাকাতি, ইংরেজ নিধন, সম্মুখাসম্মুখী লড়াই (পাহাড়তলি চট্টগ্রাম) প্রভৃতি আত্মদান যজ্ঞের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি বর্ণনা করেছেন। এঁদের বিচার ও সাজা অনুসরণ করে আমাদের নিয়ে গেছেন সেলুলার জেলে। সেখানকার ইতিহাস ও গৌরবজনক আন্দোলন অনশন, গুলির যথাযথ বর্ণনাও এ গ্রন্থে আছে। এগুলি সর্বদা তিনি নিজে বর্ণনা করেন নি। বিভিন্ন সহযোগীর রচনাগুলিও তুলে দিয়েছেন। (২) যেমন সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার বা সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ মহাশয়ের রচনার উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। (৩) সরকারি দলিল বা নথিভুক্তি ও পত্র-পত্রিকার উক্তিও সমাবিষ্ট করেছেন। (৪) তিনি তাঁর নিজের অনেক রচনা যা সময়োচিত ভাবে কালান্তর বা অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—সেগুলিকে এখানে যথাযথ বিন্যস্ত করেছেন। এর সবগুলিতেই মূল্যবান তথ্য আছে ঠিকই। কিন্তু সুসম্পাদিত হলে এগুলি আরও একটু উপভোগ্য হত এবং মনোযোগ ডিরেইন্ড হত না। (৫) এ গ্রন্থে শহীদ-স্মৃতি আছে, শহীদ-স্মারক স্থানকে স্থায়িত্ব দেবার পূর্ণ প্রয়াস বিধৃত আছে। তদুপরি আছে সেই প্রসঙ্গে যা তৈরি করা জরুরি বলে তিনি মনে করেছেন সেই সর্বভারতীয় মৈত্রচক্রের সংগঠন ও সফলতাকে লোকসমক্ষে তুলে ধরা। এই এতগুলি মেথড ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে আমরা এক মহৎ কর্মী প্রাণময় বঙ্গেশ্বর রায়কে আবিষ্কার করি। তা সত্ত্বেও এ গ্রন্থের মূল্য স্বীকার করি বলেই আমাদের আশা পরবর্তী সংস্করণে তিনি আরও যুক্তিপূর্ণ ভাবে লজিক্যাল উপস্থাপনায় এই আশ্চর্য জানা এবং অজানা তথ্যগুলি পাঠক-সমীপে উপস্থাপিত করবেন। বইখানি তখন শুধুমাত্র জার্নালিস্ট পদ্ধতি সাপেক্ষ না হয়ে এক ক্লাসিক্যাল গৌরব লাভ করবে। তা সত্ত্বেও এ গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য তো তা আগেই বলা হয়েছে।

এতগুলি মেথডে উপস্থাপিত তথ্যের মধ্য থেকে আরও দুটি ঐতিহাসিক চরিত্রচিত্র বার হয়ে এসেছে। সেই দুটির বর্ণনা করে এ প্রবন্ধ শেষ করব। এ গ্রন্থে একটি বিশেষ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এটি হল চন্দননগরে আত্মগোপনকারীদের সমষ্টিকে কালীপদ ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। বিনয়-বাদল-দীনেশ, প্রীতিলতা, লীলা রায়, গোপীনাথ, প্রদ্যোৎ প্রমুখ মহৎ মানুষের আত্মদানের বিবরণের পাশেই উজ্জ্বল হয়ে আছে শহীদ আসফাকউল্লার কথা এবং পরবর্তী কালে হুগলীর সিরাজুল হকের কথাও। ১৯২৬ সালে নিজের বিপ্লবী জীবনের প্রস্তুতির কালে লেখক কাকোরী ষড়যন্ত্রমামলার দুনম্বর পর্যায়ের এক অভিযুক্ত বিপ্লবীর নাম কাগজে দেখেন। তিনিই আসফাক-উল্লা। তিনি আবিষ্কার করার মতো বুঝলেন যে আসফাকউল্লা ব্যতিক্রম নন। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামীদের ব্রিটিশ শাসনকে বার বার যাঁরা নাড়িয়ে দিয়ে গেছেন

তাঁদের এক ধর্ম এক জাত। সেই আজিমুল্লা কী টিপু সুলতান, কী ঝান্সীর রানী হন, অথবা তিতুমীর বা মোরেলগঞ্জের রহিমুল্লা (বাংলা-দেশের লেখিকা রিজিয়া রহমান বেগম বলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় হাকিম, তখন দেখা করেন) এবং সেই ধারায় আসফাকউল্লা কিংবা শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহমদ সাহেবের পরিচয় হল মানুষ—যাঁরা মানুষের স্বীকৃতি চেয়েছেন। সাহারানপুরে ফয়জাবাদ জেলে দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠচরিত্র এ মানুষের ফাঁসি হয়। তিনি কোরানের পবিত্র আয়েৎ উচ্চারণ করতে-করতে শহীদ হলেন। পঞ্চাশ বৎসর পর এই প্রায় বিস্মৃত শহীদের বংশজ দুই ভ্রাতুষ্পুত্রসহ লেখকের সাক্ষাৎ হয়। (পৃ ৩২)। পৃ ২৭৩-এ আছে সিরাজুল হকের কথা। ২০শে ডিসেম্বর ১৯৩২-এ মহারাজা জাহাজে ডাণ্ডা-বেড়ি পরে বন্দীর দল চলেছেন সুদূর পোর্টব্লেয়ার। হিন্দুর পুরোহিত, মুসলমানের মৌলভী ও খ্রীষ্টানের পাদরিরও শুভাশিসের ব্যবস্থা আছে। চলন্ত জাহাজে সিরাজুল হক কালীরায়কে গান গাইতে বলেছেন—জানা গেল রবীন্দ্রনাথের গান—'যাবার বেলায় পিছু ডাকে'। কুখাদ্য ভোজন করে জাহাজ থেকে অবতরণ—পাঁচ নম্বরের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী থাকা এবং তাঁর মধ্যেই জেলে সাংস্কৃতিক চর্চা অভিনয় ইত্যাদি সর্বত্রই সিরাজুল হক বর্তমান। তাঁর সঙ্গীতপ্রীতি তাঁকে সর্বত্র জনপ্রিয় করে রেখেছিল। বস্তুত মুক্তি পাবার পরও তিনি বন্দীজীবনের কাছাকাছি থাকা অন্তরঙ্গ মানুষের সঙ্গপিপাসু ছিলেন। তাঁরই মাথায় প্রথম একটা নিয়মিত অধিবেশন ও সেইজন্য একটা স্থানের ব্যবস্থার কথা এসেছিল। পরবর্তী ভূমিকা মৈত্রীচক্রের চক্রধরদের হাতে। সিরাজুল ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে আন্দামান থেকে ফিরে আসেন। ১৯৪২-এ স্বগৃহে অন্তরীণও থাকেন। লেখকের পরিবার সহ তাঁর পরিবারের একটি স্বচ্ছন্দ স্নেহসম্পর্ক তাঁর আমরণ বিদ্যমান ছিল। গণ-আন্দোলনের কর্মে সমর্পিত এ মানুষ খবর কাগজ বিক্রির ব্যবসার সামান্য আয়ে সংসার চালাতেন। শেষ পর্যন্ত দুটি কন্যার পরপর বিয়োগের পর ব্যথিত-চিত্ত পিতারও মৃত্যু ঘটে। একরকম তাঁরই কথায় একদা ১৯৬৭ সালের ২৯শে মে রবিবার শিয়ালদহ-স্টেশনের ক্লেমব্রাউন এলাকায় সন্নিবিষ্ট কিছু যুগান্তর দলের বিপ্লবী কর্মীর সমাবেশে এই একত্র হবার প্রসঙ্গ সিরাজুল হক উত্থাপন করেছিলেন। সেই সমাবেশই শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় মৈত্রীচক্র হয়েওঠে—তদানীন্তন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর আনুকূল্য পায়—বাবা পৃথ্বীসিং আজাদ সহ কয়বার আন্দামান সেলুলার জেল পুনর্দর্শন করে। গুঁড়িয়ে দেওয়া কিছু অংশ নিয়ে আন্দোলন করে বাকীটুকু জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসে। লেখক অক্লান্ত প্রয়াস করেছেন এবং সেই প্রয়াসের আদ্যন্ত এ গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

পরিশেষে একটা কথা না বললে গ্রন্থালোচনা সম্পূর্ণ হয় না। একথা আজ প্রায় সবারই জানা, দ্বীপান্তরবাসী বন্দীরা অথবা এদেশের দীর্ঘমেয়াদি সকল বন্দীরা জেলের ভিতরে অনেকেই ধীরে-ধীরে মার্কসবাদী দর্শন ও কার্যক্রমের দিকে আকৃষ্ট হন। জেলের বাইরে এসে তৎকালীন অনুশীলন দল ও যুগান্তর দলের অন্তর্ভুক্ত বিপ্লবীরা তখন অনেকেই কমিউনিস্ট হন। কমিউনিজমও একপ্রকার জাতি-গোত্রহীন পংক্তি হিসাবে বহু বিরোধী দলের মানুষ-দের একত্র করেছিল ও করে রেখেছে এখনও। এই ক্রমোত্তরণও হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে একটা আন্তর্বিশ্ব পথের সন্ধান দিয়েছে—যেটা শুধুমাত্র ভারতীয় বলা যায় না।

উপসংহারে বলি, আমরা মানুষেরা বৃহত্তর কর্ম-কাণ্ডে ব্রতী হলে ক্রমশ নিজস্ব সংসার সমাজ পরিবেশ দেশ ও বিশ্বান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যেতে পারি। লেখক নানাভাবে নানাসূত্রে সেই কথাটা এ গ্রন্থে বিশদ করেছেন। কোন স্বপ্নই একেবারে সত্য হয় না এবং কোনও সত্যই স্বপ্ন বা ভিশন ব্যতিরেকে প্রত্যয়িত হতে পারে না। লেখককে আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ভারতে গ্রামোফোন-শিল্পের ইতিহাস

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

রবিবাসরের সম্পাদক সন্তোষকুমার দে কর্মজীবনে গ্রামোফোন কোম্পানি হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর প্রচার-অধিকর্তা ছিলেন। তাঁর রচিত *Gramophone in India* নামক বইখানি হাতে পেয়ে মনে পড়ল—তিনিই "সপ্তয়" ছদ্মনামে "সপ্তয় উবাচ" নামে এক জীবনী-উপন্যাসে বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার প্রতিষ্ঠাকালের চমকপ্রদ ইতিহাস বর্ণনা করে বলতে গেলে বাঙলা ভাষায় শিল্পবিকাশের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর সেই পথিকৃতের কাজ আরও প্রতিষ্ঠিত হল। এই গ্রন্থে গ্রামোফোন-শিল্প ১৯০১ সনে ভারতবর্ষে আসা থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাসই শুধু বর্ণিত হয় নি, তার পটভূমিকা হিসাবে আমেরিকার টমাস আলভা এডিসন কর্তৃক 'ফনোগ্রাফ' আবিষ্কার থেকে তার বিবর্তনের কথাও বিবৃত হয়েছে।

ছোটোবেলায় আমরা গ্রামোফোনকে 'কলের গান' বলতাম এবং তখন আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, কী করে মানুষের কণ্ঠস্বর রেকর্ডে মুদ্রিত এবং পুনরায় শ্রুতিগোচর করা সম্ভব হয়। পরে রেকর্ডের নানা বিবর্তনও দেখেছি। সন্তোষবাবুর তথ্য-ঠাসা গ্রন্থটি পড়ে বুঝলাম, প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানতাম না। তিনি সমগ্র বিষয়টির অ-আ-ক-খ থেকেই সহজবোধ্য ভাষায় বুঝিয়ে বলেছেন।

গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে ফরাসি কবি চার্লস ক্রসের ফরাসি ভাষায় লেখা কবিতা দেওয়া হয়েছে। তিনি ১৮৭৭ সনের এপ্রিলে ফরাসি বিজ্ঞান পরিষদে তাঁর একটি পরিকল্পনার কথা পেশ করেছিলেন যাতে শব্দ-তরঙ্গ ধাতুর পাতে ফটো এনগ্রেভিং করে পুনরায় শ্রুতিগোচর করবার বিষয় বলা ছিল। কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত করা হয় নি। ওই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমেরিকার এডিসন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ পরিকল্পনা অনুসারে ফনোগ্রাফ-যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে স্বর রেকর্ড করা আর বাজিয়ে শোনা—দুটিই সম্ভব হয়েছিল।

চার্লস ক্রসের ফরাসি কবিতাটির অনুবাদ করে দিলাম—

মর্মরে খোদিত মূর্তি অভিজ্ঞানে যেমন বিধৃত
তেমনি যন্ত্রের মধ্যে রেখে দিতে চাই সেই সুর
যা একদা হয়েছিল প্রিয়কণ্ঠ হতে উচ্চারিত
স্বপ্নাতুর মায়াজাল সৃষ্টি করে' সুরের জাদুর
মুহূর্তে হারিয়ে গেছে, যাতে সেই গীতলেখা ফের
তৃপ্ত করে সুধাসুরে পূর্বের মতই আমাদের।
উড়ে যেতে চায় কাল, আমি তারে করি পিঞ্জরিত॥

গ্রন্থের মুখবন্ধে দি গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইনডিয়া লিমিটেড-এর প্রেসিডেন্ট তথা চীফ একজিকিউটিভ প্রদীপ চন্দ তাঁর অতি সুলিখিত প্রশংসাপত্রে সন্তোষবাবুর সম্বন্ধে যা বলেছেন তাও সর্বাংশে সত্য। তিনি ঐ সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘ তিরিশ বৎসর যুক্ত ছিলেন (১৯৪৮-১৯৭৭)। সুতরাং ভারতে গ্রামোফোনের ইতিবৃত্ত লেখবার পক্ষে তাঁর যোগ্যতায় মি. চন্দ নিঃসন্দেহ। তা ছাড়া, তাঁর গবেষণাপ্রবণতা ও তথ্যসংগ্রহের নিষ্ঠার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

সন্তোষবাবু এ বইটিতে পথিকৃতের কাজ করেছেন। পরে যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা করবেন তাঁরা এটি আকরগ্রন্থ হিসাবে পাবেন। গ্রন্থটির মূল্য যে কত গভীর তা বোঝা যায়—এ বিষয়ে যাঁরা সবচেয়ে অভিজ্ঞ সেই লনডনের মূল গ্রামোফোন কোম্পানি সন্তোষবাবুকে এর জন্য লনডনে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেখানকার বৃহৎ আর্কাইভ তাঁকে

Gramophone in India. Santosh Kumar De. D. M. Library, Calcutta-6. Rs. 50.00

দেখিয়েছেন। লনডনের মতো নিউ ইয়র্কেও সন্তোষবাবুকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এই গ্রন্থে জানা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে খেত্রীর মহারাজাকে একটি ফনোগ্রাফ-যন্ত্র পাঠিয়েছিলেন। আর কলকাতার ব্যবসায়ী এইচ. বোস ফনোগ্রাফ-যন্ত্র আনিয়ে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' গান রেকর্ড করেন। সম্পূর্ণ বিলুপ্ত সেই মহামূল্য রেকর্ডখানিও সন্তোষবাবুর চেষ্টায় পুনরাবিষ্কৃত হয়। ভারতের বহু মনীষী গ্রামোফোনে রেকর্ড করেছেন আর অগুনতি ভারতীয় শিল্পী গ্রামোফোনের মাধ্যমে তাঁদের শিল্পকলা ভবিষ্যৎ কালের জন্য সুরক্ষিত করেছেন। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থখানির প্রতি সকল গবেষক ও সঙ্গীত-অনুরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মতামত

১

'ভারতে ইসলামে আমরা গোঁড়া ধর্মান্ধতার একটা ধারাও প্রত্যক্ষ করি।'

জানুয়ারির পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বেণু গুহঠাকুরতার "ধর্মনিরপেক্ষতার ভারতীয় রূপ" নামক মুক্ত মনের বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য লেখক এবং সম্পাদক মহাশয়কে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাবার সঙ্গে-সঙ্গে যে চিন্তা-ভাবনা মনে জেগেছে চতুরঙ্গের সুধী পাঠকদের সঙ্গে সে প্রসঙ্গে সহচিন্তন করার জন্য এই পত্রের অবতারণা।

'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে'—এর যে প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল ছিল তার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখক বলেছেন : 'যারা এখানে এসে ঠাঁই করে নিয়েছে, তারা তা নিজের জোরেই করেছে। আর যাদের আমরা ঠাঁই দিয়েছিলাম, তারা সর্বাংশেই ছিল তখনকার হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে থাকা। ফলে, উন্নত হিন্দু সমাজের মধ্যে তাদের ঠাঁই হওয়াটা ছিল তাদের পক্ষে এক ধরনের প্রমোশান। তাই, হিন্দু সমাজের জাতপ্রথার মধ্যে তাদের হারিয়ে যেতে বেশি সময় লাগে নি।' অতঃপর তিনি বলেছেন যে, সমস্যার সূত্রপাত হল যখন তুর্ক-মঙ্গোলরা ভারতে এসে জাঁকিয়ে বসল। তখন হিন্দু সমাজে ম্লেচ্ছ শব্দের আসনলাভ স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। হিন্দু সমাজকে ম্লেচ্ছের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে কল্কি অবতার এসে গিয়েছেন। অথচ মুঘলরা শক-হুন ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ওঠে এবং তা হল : ইরান বা এমনকী ইন্দোনেশিয়াতেও ইসলাম পূর্বপ্রচলিত ধর্মের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য অতীতের ঐতিহ্য—ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে এসব দেশের অধিবাসীদের সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায় নি। ধর্ম ও জাতীয়তা যে পৃথক এবং ধর্মান্তর হলেই জাতীয় সত্তা পরিবর্তিত হয় না, তার প্রমাণ ইরান ও ইন্দোনেশিয়া। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষ করে ইসলাম-ধর্ম-গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে এর থেকে ভিন্নতর মানসিকতা দেখা দিল কেন? গ্রীকরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় পশ্চাৎপদ ছিল না। তারা কী করে একরকম চিহ্ন না রেখেই এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে আত্মবিলীন করল? পার্শী ও ইহুদীদের ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবশ্যই আছে যা কেবল উপাসনার স্থল ও পদ্ধতিতেই নয়, বিবাহ বা অন্যবিধ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রকট। পার্শী সমাজ এখনও বেশ কিছুটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবু ভারতীয় পার্শী ও ইহুদিরা জাতীয়তার ক্ষেত্রে (এর রাজনৈতিক অর্থে) ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে এখনও এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত কেন?

কথা উঠতে পারে যে, গ্রীক অথবা পার্শী-ইহুদীরা এক কালের শোষিত অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের হিন্দু নন, যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাই তাঁদের ভিতর শত শতাব্দীর শোষণ আর বঞ্চনার আক্রোশের রেশ নেই, যা মুসলমান সমাজের ভিতর মূল সমাজ অর্থাৎ হিন্দুদের সম্বন্ধে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু ভারতীয় খ্রীষ্টানদের বৃহত্তম অংশের তো একই পূর্ব ইতিহাস। এবং সংখ্যার দিক থেকেও তাঁরা একেবারে উপেক্ষণীয় নন। কিন্তু সমন্বয়প্রক্রিয়ায় খ্রীষ্টানদের তো সহজে আত্তীকরণ হয়েছে এবং হচ্ছে। যদি বলা হয় যে ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদ (প্যান ইসলাম) আত্তীকরণের বাধক, তাহলে জবাব হল এই যে খ্রীষ্টান—বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিকদের—মধ্যেও (একমেব ধর্মগুরু পোপ এবং তাঁর ধর্মীয় সংগঠন বা চার্চের মাধ্যমে) এই আন্তর্জাতিকতাবাদ বোধহয় অপেক্ষাকৃত বেশি ক্রিয়াশীল। কিন্তু তা তো সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাঙ্কীকরণের বাধক নয়। গোঁড়া হিন্দুর পরিভাষায় খ্রীষ্টানও ম্লেচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত গীর্জায় না গেলেও বহু হিন্দুর ঘরে খ্রীষ্টায় বড়

দিন বেশ উৎসাহসহকারেই পালিত হয়। আর ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর মূর্তি বা ছবি অনেক হিন্দুর ড্রইং রুমের শোভা বর্ধন করার সঙ্গে-সঙ্গে মানসিক প্রেরণার উৎসেরও কাজ করে থাকে। কিন্তু কোনো ইসলামীয় প্রতীক এভাবে হিন্দুদের ঘরে স্বীকৃত হতে পারে নি কেন? পীরপূজা অথবা দরগা-মাজারে যাবার প্রথা অবশ্য লোকায়ত স্তরে আছে। কিন্তু তাও প্রধানত নিরুপায় হলে—অসুখে অথবা কাঙ্ক্ষাপূর্তির জন্য মানতের উদ্দেশ্যে। যাই হোক, প্যান ইসলামের অন্যতম উপাদান "উম্মা" যে এ যুগে নিছক কল্পনা তার প্রমাণ অর্থশতাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের হানাহানি-সঙ্ঘাত পারস্পরিক যুদ্ধ যার সর্বাধুনিক নিদর্শন (ইরাক-ইরানের আট বছরের লড়াইয়ের ইতিহাস শিয়া-সুন্নীর বিবাদ বলে ছেড়ে দিলেও) কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে একদিকে ইরাক এবং অন্য দিকে আমেরিকা-ব্রিটেনের সাহায্য-পুষ্ট বহুরাষ্ট্রীয় ফৌজে সৌদি আরব, মিশর এবং তাদের সঙ্গী মুসলিম রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক হত্যা ও ধ্বংসলীলা।

প্রশ্নটির একটি উত্তর পাওয়া যায় লেখক-কর্তৃক উদ্ধৃত নীরদ চৌধুরী মহাশয়ের বক্তব্যে: '…not only were they (Muslims) themselves the creators and defenders of a new and aggressive culture, they had a fanatical conviction of its superiority to all others and thought it was their duty to propagate it by force.'

ভারতে আমরা ইসলামে যে গোঁড়া ধর্মান্ধতার একটা ধারাও প্রত্যক্ষ করি পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা থেকে সম্ভবত তার উৎস আবিষ্কার করা যায়।

মুসলমান সমাজকে প্রভাবিতকরতে সক্ষম এমন নেতাদের একটি অংশ এখনও ইসলামের প্রথম যুগের রাষ্ট্রের ধারণা দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হারবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। এর সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি সমস্যা যুক্ত হয়েছে এবং তা হল হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের এবং আন্তর্জাতিক স্বরূপের উদ্ভব। স্বভাবতই পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশের ঘটনাবলী পরস্পরকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র হওয়ায় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার সাফল্যে ওদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যৌক্তিকতা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা কেবল পাক মৌলবাদীদের মনেই নেই, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কারণে লাভবান ক্ষমতাধীশ রাজনৈতিক নেতা-আমলা ও ব্যবসায়ী সমাজেও প্রবল। বাংলাদেশেও অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রায় হলেও পূর্বোক্ত শক্তিসমূহ ক্রিয়াশীল। স্বভাবতই ওইসব শক্তিরও কামনা—ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যর্থ হোক। (ভিন্ন কারণে ভারতের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরও একই বাসনা।) ওইসব কামনা যে সময়-সুযোগে সক্রিয় চেষ্টায় রূপান্তরিত হয়, মানব-স্বভাব সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তা বুঝতে পারবেন। যাই হোক, রাষ্ট্র ও সমাজের ধ্যানধারণায় নানা বিবর্তনের পর বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বহুমাত্রিক বা প্লুরালিস্ট সমাজের পক্ষে আদর্শ বিবেচনা করা হয়েছে প্রয়োজনে তার সপক্ষে তের শ বছরেরও প্রাচীন ইসলামের পূর্বোক্ত রাষ্ট্র-ধারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার নিদর্শনও মুসলমান সমাজের অভিমত-সৃষ্টিকারীদের মধ্যে তেমন প্রবল নয়। এইভাবে প্রাচীন ইসলামের অপর এক বিশ্বাস প্রথা ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাজনীতির অভিন্নতাকেও প্রকাশ্যে বর্জন করা ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্বপদের দাবিদার ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। (দুর্ভাগ্যক্রমে শিখ সমাজের মুখর অংশের নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রেও একথা সত্য যেজন্য ভিন্দ্রানওয়ালে এখনও তাঁদের হিরো এবং স্বর্ণমন্দিরসহ বহু গুরুদ্বার উগ্রপন্থীদের আখড়া।) এক্ষেত্রেও আধুনিক শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণায় দীক্ষিত মুসলমানদের প্রভাব বহুস্তর মুসলিম সমাজে একান্তভাবেই ক্ষীণ। এদেশে সাম্প্রতিক কালে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের যে

মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটেছে তার পিছনে এও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এসব সত্ত্বেও নীরদবাবুর বক্তব্যকে আংশিক সত্যের বেশি স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রথমত খ্রীষ্টান ইংরেজও ওই একই মানসিকতা (white man's burden) নিয়ে এদেশে শাসকের ভূমিকা পালন করেছিল। ইংরেজ শাসকবর্গের প্রশ্রয় ও সমর্থনপুষ্ট খ্রীষ্টীয় মিশনারিদের হিন্দুবিদ্বেষের অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর তার প্রভাব হিন্দু-খ্রীষ্টানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির নিয়মে ইসলামও স্থান ও কাল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতে তার আদিম আরবীয় রূপ থেকে বহুলাংশে বিবর্তিত হয়েছে। যার কারণ ওহাবি বা ফরাজি আন্দোলনগুলির মাধ্যমে আদি ইসলামে প্রত্যাবর্তনের কথা উঠেছে। এই বিবর্তন সম্বন্ধে অধ্যাপক মহম্মদ মুজিব তাঁর *The Indian Muslim* গ্রন্থে বহু উদাহরণ পেশ করেছেন। বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের এ-জাতীয় স্থানীয় বিবর্তনের বহু উদাহরণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাঙলার ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থে আছে। আর সর্বশেষে উল্লেখ করলেও এর সর্বাপেক্ষা জোরালো যুক্তি ইসলামে সুফী ভাবধারার উদ্ভব যা এই 'দিবে আর নিবে/মিলাবে মিলিবে' সত্যের প্রতীক। আমরা জানি যে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের বড় একটা অংশ সুফী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত যা নীরদবাবু-কথিত কট্টর শরীয়তি মানসিকতার দ্বারা চালিত নয়।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনা ঘটলেও পরিকল্পিত ভাবে সাম্প্রদায়িক (এবং caste বা জাতিগতও) বিরোধের বীজ উপ্ত হয় সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দ্বারা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এর মূলে ছিল ১৮৫৭ খ্রী-এর মতো হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বিদ্রোহ ভারতে যাতে আর না হতে পারে তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৮৫৯ খ্রী নিযুক্ত রয়াল কমিশনের প্রতিবেদন। প্ররোচনাদানকারী তৃতীয় পক্ষ রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত হয়ে গেলেও আমরা যে এখনও আত্মস্থ হতে পারছি না তার মূলে কি তাহলে আর কোনো কারণ আছে?

শেষ করার পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর "মুসলিম জনসংখ্যা কি বাড়ছে?" প্রবন্ধটির জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। তাঁর তথ্যঋদ্ধ রচনা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মিথ্যা প্রচারের উপযুক্ত জবাবই নয়, বর্তমান সঙ্কট-মুহূর্তে দূরভিসন্ধিমূলক প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শক্তিশালী হাতিয়ার।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
"চারু-নীড়", কামড়হরি
গড়িয়া, কলিকাতা-১০০ ০৮৪

২

বেণু গুহঠাকুরতার উত্তর

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দিই এইজন্য যে, আমার লেখাতে হিন্দু মানসিকতার যে দৈন্যের দিকটির দিকে আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তাঁর চিঠিতে।

আমার লেখার মূল সুর যেটা ছিল সেটা এই:

১। আমরা হিন্দু আর মুসলমান উভয়েই সমভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির শিকার—বহিঃপ্রকাশে ফারাক থাকা সত্ত্বেও।

২। ইসলাম যখন এদেশে আসে তখন হিন্দুসমাজ তার ধর্মীয় উদারতা ত্যাগ করে গোঁড়ামির নাগপাশে নিজেকে বেঁধে ফেলছে। সেটা হল একাদশ শতাব্দীর শুরু। আর সেটা আরও চেপে বসল, যখন তুর্ক-মোঙ্গলরা এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করে সাম্রাজ্যবিস্তারে মন দিল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

৩। ইংরেজের আগমন ব্যবসার সীমানা অতিক্রম করে যখন সাম্রাজ্যে পরিণত হল, তখন তা পরস্পরকে

আরো স্থায়িভাবে আলাদা শিবিরে ভাগ করে দিল। ইংরেজ তার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল পশ্চিমের ভাবধারা, যার প্রধান কথা স্বাধীন চিন্তা, ব্যক্তির অধিকার আর আধুনিক রাষ্ট্রীয় চেতনা।

আমরা একসাথে লড়াই করি নি, তা নয়। উদ্দেশ্য এক ছিল, কিন্তু পদ্ধতি আলাদা। পশ্চিমী ভাবধারা আমাদের ভারতীয় চেতনার উন্মেষ করেছে, কিন্তু আচ্ছন্ন করতে পারে নি। ফলে, আমরা ভারতীয় হতে পারি নি। থেকে গেলাম হিন্দু আর মুসলমান—এই দুই বৃত্তের মধ্যে। সমাজপরিবর্তনের চিন্তার অভাবে মানসিকতা আমাদের থেকে গেল মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার মধ্যে—আকাশে "অগ্নি" নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও; আর এইখানেই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতা।

পার্শি আর ইহুদিদের কথা তুলে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পরোক্ষে আমার মতকেই সমর্থন করেছেন। তাঁরা একটা নির্দিষ্ট ধর্মমত নিয়েই এদেশে এসেছিলেন। তাই তাঁরা হারিয়ে যান নি হিন্দু সমাজের মধ্যে, যদিও তাঁরা হাজার-হাজার বছর এদেশে থেকেও ভারতীয় মানসিকতার কতটুকু শরিক, সেটা তর্ক-সাপেক্ষ। শক হুনরা হারিয়ে গিয়েছিল, তার কারণ আগেই বলেছি। গ্রীকরা যে অল্প সংখ্যায় ভারতের মতো মহাদেশে এসেছিল, তাতে তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না, যদিও ভারতীয় সভ্যতায় হেলেনিক প্রভাব একেবারে পড়ে নি, তা নয়। ইন্দোনেশিয়ায় বা ইরানে ইসলাম তার আধিপত্য নিশ্ছিদ্রভাবে কায়েম করেছিল, কাজেই তার জাতীয় সত্তার বিলোপের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমাদের এখানে প্রশ্নটা অন্যরকম ছিল। হিন্দু সমাজ তখন নতুনকে গ্রহণ করতে অক্ষম। অপরদিকে যারা তার সঙ্গে রইল, তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামির নাগ-পাশে বেঁধে ফেলল। পান থেকে চুন খসলেই বিপদ, সমাজ থেকে বিতাড়িত হতে হবে। সে তখন নিজের ধর্মের মানুষকেই ভালোবাসতে অক্ষম। বিধর্মীকে ভালোবাসার তো কোনো প্রশ্নই নেই।

এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে অগণিত। এই সেদিনও সমুদ্র পেরুলেই জাতিচ্যুত হতে হত। স্বামী বিবেকানন্দেরই এক জাতিভ্রাতা খ্রীষ্টান হয়েছিলেন বাধ্য হয়ে, কারণ তিনি জাহাজে বিলেতও যান নি—গিয়েছিলেন বোম্বাই। দৃষ্টিভঙ্গিই তো সবাইকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। নিজের কাজে একবার বালেশ্বর গিয়েছিলাম। সেখানে শতাধিক বৎসরের পুরোনো কনভেনট আর গির্জা দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। কারণ আশেপাশে খ্রীষ্টধর্মের প্রাবল্য ছিল না। উত্তরটা হঠাৎই পেয়ে গিয়েছিলাম আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের জনক ফকিরমোহন সেনাপতির "আত্মচরিত" পড়তে গিয়ে। কারণটা তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক : 'পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। দুর্ভিক্ষের পরের বছর কতগুলি বালক-বালিকা ও লোক পথে-পথে ঘুরে বেড়াত। ছত্রে খাওয়া লোক বলে হিন্দু সমাজ তাদের তাড়িয়ে দিল কিন্তু মিশনারিরা তাদের আদর করে কোলে টেনে নিল এবং পুত্রবৎ প্রতিপালন করে শিক্ষিত এবং উপযুক্ত করতে লাগল। এইখানেই হিন্দুধর্মের এবং খ্রীষ্টান ধর্মের পার্থক্য জানতে পারা যায়।···দুরবস্থায় পড়ে প্রাণরক্ষায় অতি নিম্নস্তরের অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শযুক্ত অন্ন গ্রহণ করা দোষের নয় বলে হিন্দু পুরাণশাস্ত্রগুলিতে নির্দেশ আছে।' (আত্মচরিত, পৃ ৫৬, সাহিত্য একাডেমী, নয়াদিল্লী, অনুবাদ : মৈত্রী শুক্লা)। শাস্ত্রের বিধান থাকা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজপতিরা এদের বিধর্মী হতে বাধ্য করেছিলেন। এরপর আর নিজেদের উদারতা নিয়ে গর্ব করা বোধহয় সঙ্গত হবে না।

'আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি। মুসলমানের ত্রুটিবিচারটা থাক—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি, তবে সেজন্য যেন লজ্জা স্বীকার করি।' (রবীন্দ্রনাথ—"হিন্দু-মুসলমান", শ্রাবণ ১৩৩৮)—কথাটা ভেবে দেখলে ক্ষতি কী?

খ্রীষ্টধর্মের প্রতি হিন্দুর সহনশীলতা দেখে মুগ্ধ

হবার কোনো কারণ নেই। খ্রীষ্টধর্ম সেভাবে হিন্দু-সমাজকে চ্যালেঞ্জ করে নি, আর সে ছিল রাজধর্ম। রাজশক্তি এদেশে খ্রীষ্টধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে খুবই সীমিত ভাবে, তাও সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ—এসব ঘটে যাওয়ার পরে। ইংরেজ প্রথম যুগে এদেশে খ্রীষ্টান পাদরি আসা নিষিদ্ধ করে-ছিল। রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে যে কজন না হলে নয়, সে কজনই আসত আর তারা হত রাজকর্মচারী। আর তাকেও হতে হবে অ্যাঙলিকান চার্চের সভ্য। ইংরেজ জাহাজে কোনো পাদরি এদেশে আসতে পেত না। কলকাতা শহর ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। তাই উইলিয়ম কেরি এদেশে এসেছিলেন দিনেমার জাহাজে চেপে আর উঠেছিলেন মালদার এক নীল-কুঠিতে চাকরি নিয়ে। পরে শ্রীরামপুরে—সেটাও ছিল ডাচদের উপনিবেশ। কাজেই খ্রীষ্টধর্মের প্রচারও ছিল নিষিদ্ধ। পরে যখন প্রধানত উপজাতিদের মধ্যে তারা ছড়িয়ে পড়ে, তার ফলাফল যে খুব ভালো হয়েছিল, তা বলা চলে না। উত্তর-পূর্ব ভারতের উত্তালতা তার প্রমাণ। এখনও তাঁদের আমরা ভারতীয় মানসিকতার সাথি করতে পারি নি। তা ছাড়া, এশীয় সমাজব্যবস্থায় না-কি অ্যাট্যাভিজম বলে একটা কথা আছে। আর সেটা নাকি ফিরে আসে বার বার। শঙ্করাচার্য, বঙ্কিম, অরবিন্দ, ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন, খোমেইনি—সবই সেই মানসিকতারই প্রতিফলন। এর থেকে বাঁচতে হলে অত্যন্ত সুস্থ মস্তিষ্কে, সচেতন মানসিকতা নিয়েই লড়াই করতে হবে। আর সেই লড়াইয়ের ডাক তো আমি দিতে পারব না। তাই শরণ নিচ্ছি আরেক বাঙালি মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের—যিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন এই বলে যে :

Practical Advaitism which look upon and behaves to all mankind as one's own soul, was never developing among Hindus. ...If ever any religion approached to this equality in an appreciable manner, it is Islam and Islam alone. I am firmly persuaded that without the help of practical Islam, theories of Vedantism, however fine and wonderful they may be, are entirely valueless to the vast mass of mankind. ...For our own motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam—Vedanta brain and Islam body—is the only hope. I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body.

স্বামীজীর পথটা যাচাই করতেই বা অসুবিধে কোথায়?

বেণু গুহঠাকুরতা
কলকাতা-১৩

৩

শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব জীবনসংগ্রামতত্ত্বের "অনেকটা অনুরূপ তত্ত্ব" নয়—

শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধটির (সেপটেমবর ১৯৯০) মুখ্য আলোচ্য বিষয় মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব ও ডারউইনীয় জীবনসংগ্রামতত্ত্বের সম্পর্ক বিচার। যে গভীরতা ও মনোযোগ বিষয়টি দাবি করে—প্রবন্ধটিতে তা নেই।

প্রথমেই জানানো দরকার ছিদ্রান্বেষণ এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মূল আলোচ্য পূর্বোক্ত সম্পর্ক-বিচার। শ্রীচক্রবর্তীর সাথে আমাদের বিচারের পার্থক্য থাকায়—ডারউইনতত্ত্বের এক জিজ্ঞাসু পাঠক হিসেবে বিভ্রান্ত বোধ করছি। এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যেই এই সবিনয় নিবেদন।

মার্কস-এঙ্গেলস ও ডারউইন সম্পর্ক

মার্কসের সাথে ডারউইনের 'সম্পর্ক' ছিল চিঠিপত্রে। এই 'সম্পর্ক' বিষয়ে বিতর্ক আজও অব্যাহত।

এঙ্গেলসের সাথে এই 'সম্পর্ক'টুকুও গড়ে উঠে নি। "ক্যাপিটাল"-এর প্রথম খণ্ড উপহারের সূত্রে ডারউইন মার্কসকে একটি চিঠি দেন—এতে দ্বিমত নেই। এটা বহুল প্রচারিত মার্কস ডারউইনকে ক্যাপিটাল-এর দ্বিতীয় খণ্ড উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এই মর্মে মার্কস ডারউইনের সম্মতির জন্য একটি চিঠি দেন এবং ডারউইন অত্যন্ত বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন—এমনই আমরা এতকাল জেনে এসেছি। এই ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই 'লোককথা'টিকে ('false') বলেছেন আমেরিকার প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী Stephen J. Gould (Ever Since Darwin, পৃ ২৬) প্রশ্ন উঠেছে, মূলত দুটি কারণে, প্রথমত, মার্কসের এই তথাকথিত উৎসর্গ-ইচ্ছার চিঠিটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। যে বইটির (নামটি ভুল লিখেছেন শ্রীচক্রবর্তী। এই আলোচনার শেষে শুদ্ধরূপ নেওয়া আছে) একটি প্রবন্ধ থেকে শ্রীচক্রবর্তী অনেক তথ্যই গ্রহণ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, 'unfortunately, Marx's letter has not been found'. ('আমার দ্বিতীয় খণ্ড আপনাকে উৎসর্গ করতে চাই'—বাক্যটি কি মার্কসের চিঠির অংশ-বিশেষ? কী এর সূত্র?)। দ্বিতীয়ত, ডারউইনের যে চিঠিটি (১৩ অক্টোবর, ১৮৮০) মার্কসকে লিখিত বলে উল্লিখিত হয়, ইদানীং অনেকেই ভাবছেন ডারউইন সেটি মার্কসকে লেখেন নি। লিখেছিলেন Dr. Edward Aveling-কে। ব্যক্তিগত সূত্রে ইনি মার্কস-জামাতা। একজন সক্রিয় ডারউইনতত্ত্বপ্রচারক ও anti-teleologist বলে তৎকালে ইনি বিখ্যাত ছিলেন। এঁর রচিত একটি পুস্তকের নাম *Student's Darwin*। এই বইটির পরিপ্রেক্ষিতে ডারউইন Aveling-কে বিতর্কিত এই চিঠিটি দেন বলে বিশ্বাস করেন অনেকে (*Encounter*; অক্টোবর, ১৯৭৮, পৃ. ৬২-৭৮)। সমগ্র চিঠিটি খুঁটিয়ে পড়লে এঁদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের সাথে সহমত পোষণ করবেন যে-কোনো পাঠকই। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে এই চিঠিটির গুরুত্ব হয়তো নেই। তবুও প্রসঙ্গটির উত্থাপন করলাম এ-প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্তী বা কোনও পাঠকের মতামত জানার জন্য।

এর পর মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ডারউইনকে পাঠানো "ক্যাপিটাল"-এর একপাতাও যে তিনি পড়েন নি, ডারউইন-গৃহ Down House-এ রক্ষিত বইটি তার সাক্ষ্য দেয়। বহুজন তার নানা কারণ দর্শান। অনেকেই মনে করেন, ডারউইন রাজনীতি-সমাজনীতি সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিলেন বলেই "ক্যাপিট্যাল" তাঁকে আকর্ষণ করে নি। মার্কসের অন্য কোনো রচনাও যে তিনি পড়েছেন, ডারউইনের আত্ম-জীবনীতে তার প্রমাণ নেই। কাজেই, মার্কস ডার-উইনকে প্রভাবিত করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে, একথা সর্বজনবিদিত 'অরিজিন' গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল মার্কসের উপর। এই বইটির গুরুত্ব যাঁরা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন মার্কস। 'অরিজিন' তিনি প্রথম পড়েন—'বোধহয়' নয়—১৮৬০ সালেই নভেম্বর-ডিসেম্বরে। পরেও তিনি বারবার বইটি পড়েছেন (দ্র. এঙ্গেলসকে লিখিত ১৮ জুন ১৮৮০-র চিঠি)। পড়েছেন *The Descent of Man* এবং অন্য লেখাও। বিভিন্নজনের কাছে চিঠিপত্রে মার্কস ডারউইন সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়া আর মাত্র একটি জায়গাতে ডার-উইন প্রসঙ্গ এসেছে। "ক্যাপিটাল" প্রথম খণ্ডের একটি ফুটনোটে (পৃ. ৩৭২-৭৩)। এই-সমস্ত তথ্য যথাযথ বিশ্লেষণ না করলে এবং সেই সঙ্গে ডারউইন-বাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে, শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব ও জীবনসংগ্রামতত্ত্বের সম্পর্কবিচার বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তাই-ই হয়েছে।

আলোচনার সুবিধের জন্য ডারউইনবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রথমে সেরে নেওয়া যাক। The term, struggle for existence used in a large sense—এই শিরোনাম দিয়ে ডারউইন এই termটি কী অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা একটি পরিচ্ছেদে বিবৃত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সমগ্র পরিচ্ছেদ থেকে শুধুমাত্র প্রথম (পৃ ৩৩৮) ও শেষ বাক্য (পৃ ৩৩৯) দুটি উল্লিখিত হয়েছে। মধ্যবর্তী বাক্যবন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই বাক্যদুটির উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলে জীবনসংগ্রামের তাৎপর্য বোঝা যাবে না। উপলব্ধ হবে না metaphorical এবং dependence-এর মর্মার্থ। বর্তমান প্রবন্ধে এমনই হয়েছে। ফলত, শ্রীচক্রবর্তী ভেবেছেন জীবনসংগ্রামের অন্তর্গত 'পরস্পর-নির্ভরতা, পারস্পরিকতা'। ডারউইন-কথিত জীবনসংগ্রামে নির্ভরতার কথা আছে (যেমন পরজীবী host-এর উপর নির্ভরশীল), কিন্তু পরস্পর-নির্ভরতা বা পারস্পরিকতা কোথাও নেই। ক্রোপোটকিনের সাথে ডারউইনের পার্থক্য, প্রথম জন mutual aid-কে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ডারউইনীয় জীবনসংগ্রাম একের সাথে অপরের—এর ধরন individualistic। সুতরাং জীবনসংগ্রামে একের উপর অপরের নির্ভরশীলতার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, এই সহযোগিতার কথা না থাকাতে এঙ্গেলস জীবনসংগ্রামতত্ত্বকে বলেছিলেন meagre and one-sided phrase (*Dialectics of Nature*) শ্রীচক্রবর্তী আরও মন্তব্য করেছেন, 'জীবনসংগ্রামকে যারা শুধু রেষারেষি, ঠেলাঠেলি, প্রতিযোগিতা কিংবা রক্তাক্ত সংগ্রাম হিসাবে দেখে, ডারউইন সেই দেখাকে, অলীক বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন'। এখানে তাঁর বলার কথাটি হল, জীবনসংগ্রামকে শুধু রেষারেষি, ঠেলাঠেলি ইত্যাদি ভাবে না দেখে, পারস্পরিকতা অন্তরভুক্ত করা হলে —তা যথাযথ হত। অর্থাৎ রেষারেষি ইত্যাদির সাথে পারস্পরিকতাও জীবনসংগ্রামের অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে জানাই, ডারউইন জীবনসংগ্রাম বোঝাতে গিয়ে severe struggle, severest war, severe competetion ইত্যাদি শব্দবন্ধ ব্যবহার করলেও কাঁচা, অমার্জিত, প্রাকৃতভাবে বিষয়টিতে দেখেন নি। ডারউইনীয় জীবনসংগ্রামের ধরন বিভিন্ন, এর পরিধি বিস্তৃত। শ্রীচক্রবর্তীর সাথে আমাদের বলবার কথাটির পার্থক্য হল, তাঁর আপত্তি শুধু রেষারেষি ইত্যাদিতে। আমাদের আপত্তি শুধু পারস্পরিকতার অন্তরভুক্তিতেই নয়, সংগ্রামকে স্থূলভাবে রেষারেষি ইত্যাদিতে পরিণত করাতেও। আবার, পরক্ষণেই যে 'সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে' তিনি জীবনসংগ্রাম বলেছেন (পৃ ৩৩৯), তা আদপেই জীবনসংগ্রাম নয়। আমাদের বিচারে তাকে খণ্ডিতভাবে দেখা প্রাকৃতিক নির্বাচন বলা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পর্কে একটি মন্তব্যতেও বিভ্রান্ত হতে হয়। মন্তব্য করা হয়েছে (পৃ ৩৩৬) 'প্রকৃতিরও একটা প্রযুক্তির সাহায্যেই কাজ চলে। তার নাম 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। কী বলতে চাওয়া হয়েছে—প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি প্রযুক্তি? কী এর ব্যাখ্যা? জানি না মার্কস-কথিত Nature's tech-nology তাঁকে এমন ভাবতে সাহায্য করেছে কিনা। তবে মার্কস কিন্তু Nature's technology বলতে অন্য কথা বলেছেন—প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলেন নি (*Capital*, খণ্ড ১, পৃ ৩৭২-৭৩)। প্রকৃতির প্রযুক্তি বলতে মার্কস জীবজগতের সেইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বুঝিয়েছেন যারা উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে তিনি অন্যত্র (পৃ ১৭৯) বলেছেন extended bodily organs। এগুলি ইতিহাসের ধারায় যুগ-যুগ ধরে পরিবর্তিত হয়েছে। উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকার দরুন, প্রযুক্তির মতো, এগুলিও সমস্ত ধরনের সামাজিক সম্পর্কের বস্তুগত ভিত্তি। মার্কস এই-ই বলেছেন। শ্রীচক্রবর্তী, 'মার্কস বলতে চান' (পৃ ৩৩৭) বলে যা বলেছেন—তা যথার্থ মনে হয় নি আমাদের।

শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব ও জীবনসংগ্রামতত্ত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধটিতে উক্ত বক্তব্য এবম্বিধ :

(ক) জীবনসংগ্রামতত্ত্বের 'অনেকটা অনুরূপ তত্ত্ব' শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব (পৃ ৩৩৬)।

(খ) 'অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও' জীবনসংগ্রামতত্ত্ব

প্রতিষ্ঠা নেয় শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বকে (পৃ ৩৩৮)।

(গ) মার্কস ডারউইনবাদ থেকে একটি বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন : তা এই জীবনসংগ্রামতত্ত্ব (পৃ ৩৩৮)।

উপরোক্ত তিনটি বক্তব্য বিশ্লেষণ করা যাক।

সামন্ততান্ত্রিক বাধনতান্ত্রিক—সমাজব্যবস্থার ধরন যাই হোক না কেন—তা নির্ধারিত হয় উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে। শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও তজ্জাত। এইসব সমাজব্যবস্থার যে অন্তর্নিহিত সংকট তা নিরসনের ও পরবর্তী উন্নত ধরনের সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের পথ—শ্রেণীসংগ্রাম (মতান্তরে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজপরিবর্তন)। শ্রেণীসংগ্রাম সমষ্টির—এক শ্রেণীর সাথে আর এক শ্রেণীর। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার আবশ্যিক শর্ত—ঐক্যবদ্ধতার পারস্পরিকতার। পক্ষান্তরে, জীবনসংগ্রাম, আগেই বলা হয়েছে, একের সাথে অপরের—individualistic। এ লড়াই অনেকটা হবসী আদলে—a war of all against all গোত্রের—যা ম্যালথাসীয় 'population fantacy' দ্বারা আচ্ছন্ন হবার ফল। সর্বোপরি, জীবনসংগ্রাম বায়োলজি রাজ্যের। সেখানে নেই অর্থনীতি, ক্যাপিটাল, সাংপ্লাস ভ্যালু। দ্বন্দ্বের ভিত্তিও নয় উৎপাদনসম্পর্ক। দুটি 'তত্ত্ব' সম্পূর্ণতই আলাদা। প্রকৃতিরাজ্যের এই তত্ত্বকে সমাজে বিস্তৃত, আরোপিত করা যায় না। তিন-তিনটি চিঠিতে মার্কস এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করেন। চিঠিগুলি যথাক্রমে এঙ্গেলস (Collected Works ; খণ্ড ৪১, পৃ ৩৮১), পল এবং লরা লাফার্গ (CW : খণ্ড ৪৩, পৃ ২১৭) লুডভিগ কুগেলম্যানকে (CW : খণ্ড ৪৩, পৃ ৫২৭) লেখা।

এসব থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জীবন-সংগ্রামতত্ত্বের 'অনেকটা অনুরূপ' তত্ত্ব—শ্রেণীসংগ্রাম-তত্ত্ব, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বা প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা দেবে—মার্কস একথা ভেবেছিলেন —এই অনুমানও ভ্রান্ত। একই যুক্তিতে প্রকৃতিতে পারস্পরিকতা লক্ষ করা গেলেও তা থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। প্রকৃতিরাজ্যের তত্ত্বকে মানবসমাজে আরোপ করেন সমাজ-ডারউইনবাদীরা। সমাজ-ডারউইনবাদ ডার-উইনবাদের বিচ্যুতি, বিকৃতি (মার্কসকর্তৃক এই বিকৃতির সমালোচনার জন্য পল এবং লরাকে লিখিত চিঠিটি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং জীবনসংগ্রামের তত্ত্বটি মার্কস ডারউইন থেকে, গ্রহণ করেন নি। করার প্রশ্নও ওঠে না। যে-যে কারণে 'অরিজিন' মার্কসের কাছে গুরুত্ব-পূর্ণ মনে হয়েছিল (এ প্রসঙ্গটি আদৌ আলোচিত হয় নি বিস্তারিতভাবে) লেনিন, বোধকরি, সবচেয়ে স্পষ্ট করে তা বলেছেন : Darwin put an end to the view of animal and plant species being unconnected, fortuitous, created by God' and immutable and was the first to put biology on an absolutely scientific basis by establishing the mutability and suceession of species (Collected Works, খণ্ড ১, পৃ ১৪২)। মানব-সমাজও eternal, immutable নয় পরিবর্তনশীল। সমাজপরিবর্তন, উত্তরণের পথ—শ্রেণীসংগ্রাম। যুগ-যুগ ধরে যা ঘটে চলেছে। এইসব পরিবর্তনের উত্তরণের ইতিহাসই—মানবসমাজের ইতিহাস। প্রকৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এই ঐতিহাসিকতার কথা সত্যি ব্যক্ত করেছেন ডারউইন—তাঁর অরিজিন-এ। Darwin's work is most important and suits my purpose in that it provides a basis in natural science for the historical class struggle—বলতে মার্কস তাই বুঝিয়েছেন। শ্রেণী-সংগ্রামের basis জীবনসংগ্রাম—এমন মার্কস বলেন নি। খ্যাত অখ্যাত বহু লেখকই এমন ভুল বারবার করে থাকেন অবশ্য।

প্রণবেশ নাথ
২ কেশি চট্টরাজ রোড
পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

ভারতের মুখ-উজ্জলকারী

লোকবিশ্রুত

যাদু সম্রাট

স্বর্গীয় পি, সি, সরকার মহাশয়ের

সুযোগ্য পুত্র

যাদুকর

স্বনামধন্য

পি, সি, সরকার (জুনিয়র)

তাঁর চিত্তচমৎকারী

যাদুবিদ্যা

প্রদর্শন করছেন নিয়মিতভাবে

মার্চ ১৯৯১ ব্যাপী

মহাজাতি সদনে